ভোর আকাশের আলো
সরল দে

পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রাছাত্রীদের জন্য নতুন সিলেবাস অনুযায়ী লিখিত।

ভোর আকাশের আলো

[পঞ্চম শ্রেণীর উপপাঠ্য]

সরল দে

ময়না প্রকাশনী
১৪/এ টেমার লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

॥ কথারম্ভ ॥

ছোটদের জন্যে এ বই লেখার প্রেরণা ছোটরাই। তবে ছোটদের যাঁরা ভালবাসেন, সেই বড়রা'ও অনেকে নানাভাবে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। সর্বাগ্রে যাঁর নাম করতে হয়, তিনি আমার সহকর্মী শ্রীমতী মীনা সেনগুপ্ত। প্রতিটি গল্পের পাণ্ডুলিপি পড়েও মূল্যবান মতামত দিয়ে অশেষ সহযোগিতা করেছেন তিনি। আর এই পর্বে আগাগোড়া সতর্ক ও সোৎসুক দৃষ্টি রাখেন আমার সাহিত্যসঙ্গী শ্রীপ্রকাশ সেনগুপ্ত ও ছোটদের সাহিত্যে নবাগতা শ্রীমতী পূরবী দে।

ছবি ছাড়া ছোটদের বই হয় না। তরুণ শিল্পী দেবকুমার ভট্টাচার্য তাঁর দক্ষ তুলির টান টেনে এ বইয়ের পাতায় পাতায় সাজিয়ে দিয়েছেন ছোটদের ভালো লাগার মতো আশ্চর্য আশ্চর্য সব ছবি। সম্ভাবনাময় এই শিল্পী ছবি-সম্বল করে জীবন শুরু করেছেন। যে শিল্প বাঁচায়, তাকে আরও সুন্দর ও সম্ভ্রান্ত করে তোলাই তাঁর সাধনার লক্ষ্য।

সবশেষে যাঁর কথা বলতেই হয়, তিনি এই বইয়ের প্রকাশক শ্রীশ্যামসুন্দর সাহু। শুধুমাত্র বাণিজ্যিক সফলতা নয়, ছোটদের হাতে ভালো ভালো বই তুলে দিতে চান বলেই এই ব্যয়বহুল প্রকাশনার ঝুঁকি তিনি নিতে পেরেছেন।

না, ধন্যবাদ নয়। আমার এই বন্ধুদের আমি শুধু ভালবাসাই জানাতে পারি।

সূচীপত্র

দস্যি ঠাকুর ॥ ১
বোপদেব ॥ ৬
বীরসিংহের সিংহশিশু ॥ ১০
ক্লাশ থেকে পালিয়ে ॥ ১৫
ক্ষুদে কবি ॥ ১৯
পড়ুয়া ॥ ২৩
ধানী ছেলে ॥ ২৭
ভানপিটে ॥ ৩০
নিজেই ইতিহাস ॥ ৩৫
ন্যাড়া ॥ ৩৯
দুখুমিয়া ॥ ৪৩
সুবি ॥ ৪৭
সত্যিকারের ভালো ছেলে ॥ ৫২
চিত্ত ॥ ৫৬
বাঘা যতীন ॥ ৬০
মজার ছেলে ॥ ৬৫
অনুশীলন ॥ ৬৯

দস্যি ঠাকুর

সে ছিল এক দস্যি ছেলে। ভারি দস্যি।

নাম তার বিশ্বম্ভর। কিন্তু নীমগাছের নীচে জন্ম, তাই মা আদর করে ডাকেন নিমাই ব'লে। আবার গৌর অঙ্গ, ধবধবে ফর্সা রঙ, সে জন্যে আর এক নাম গৌরাঙ্গ বা গোরাচাঁদ।

দামাল ছেলেকে সব সময় সামাল সামাল করে চোখে চোখে রাখতে হয়। কখন যে কি করে বসে।

বাটাভরা সন্দেশ খেতে দিয়েছেন মা।

'বসে বসে খাও তো সোনামণি।' এই বলে মা তো গেছেন ঘরের কাজকর্ম সারতে। অমনি নিমাই করেছে কি, সন্দেশ ফেলে মাটি খেতে শুরু করেছে।

দুষ্টুটাকে মা বেশিক্ষণ চোখের আড়ালে রাখেন না, হাতের কাজ ফেলেই তিনি ছুটে আসেন। কাণ্ড দেখে তো মা হতবাক। ছেলের, হাতে মাটি মুখে মাটি।

'হায় রে আমার কপাল! এ কি করছিস তুই, মাটি খাচ্ছিস?'

নিমাই মুখ তুলে মিটি মিটি হাসে। আবার কিনা বলে, 'সবই তো মাটি মা। সন্দেশও মাটি।'

ছেলের পাকা পাকা কথায় মায়ের মুখে আর রা সরে না।

এ তো জ্ঞানের কথা!

কোথা থেকে শিখলো এই দুধের বাচ্চা?

নিমাইয়ের জ্বালায় পাড়াপড়শিরাও অতিষ্ঠ! নিত্যি নিত্যি একটা অঘটন ঘটিয়ে আসছে নিমাই। আর তাই পড়শিদের নালিশ লেগেই আছে। হয়তো এ বেলায় একজন এসে বলল, 'ও বউ, তোমার ছেলে সামলাও।' আবার ও বেলা একজন ছুটে এল ধড়ফড়িয়ে, 'ও নিমাই-এর মা, দেখে যাও তোমার ছেলের কীর্তি।'

মায়ের কান ঝালাপালা। কত আর শুনবেন?

মেয়েরা গেছে গঙ্গার ঘাটে চান করতে।

নিমাই দিলে আচ্ছা করে জল ছিটিয়ে। না হয় নিঃসাড়ে জলের তলা থেকে পা ধরে হঠাৎ দিলে টান।

মেয়েরা ঘাটে পূজো দিচ্ছে। সেখানেও দস্যিটা হাজির।

ফুলের ডালা থেকে টপ্ করে মালাটা তুলে নিয়ে গলায় পরে নিমাই। চন্দন নিয়ে

কপালে ফোঁটা দেয়। গম্ভীর হয়ে বলে, 'আমি তোমাদের ঠাকুর আমার পুজো করো, তোমাদের বর দেবো।'

ছেলেটার কাণ্ড দেখে মেয়েরাও তো হাঁ।

নিমাই সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়ায়। এর বাড়ি তার বাড়ি হানা দেয়। খাবার দাবার যা পায়, নিয়ে সট্‌কে পালায়।

ধর্‌ ধর্‌ বলতে বলতেই ছুট্‌।

ঠিক যেন দ্বাপরের সেই দস্যি-দামাল ননীগোপাল। সেই ননীচোরা।

তা এত যে দুষ্টু, 'হরি হরি' বললেই কিন্তু চুপ। তখন সে আর এক নিমাই।

নিমাই যখন খুবই দুরন্ত হয়ে ওঠে, মা তখন তাকে ঠাণ্ডা করতে তার কানের গোড়ায় বলেন—'হরি হরি।'

নিমাই-এর একটা খেলা, বন্ধুদের নিয়ে নেচে নেচে 'হরিবোল হরিবোল' বলে গোল হয়ে ঘুরতে থাকা। এটা তার খুবই প্রিয় খেলা।

দস্যি ছেলের দৌরাত্ম্যে সবাই রাগ করে। কিন্তু একবারটি তার দিকে চোখ তুলে তাকালে সব রাগ জল হয়ে যায়। তখন তাকে ভাল না বেসে পারা যায় না।

আহা কী চাঁদপানা মুখ! কী রূপ!

এ যেন দেবশিশু।

নিমাই দুষ্টুমি করেছে। মা তাড়া করেছেন খুন্তি হাতে।

নিমাই ছুটেছে।

ঘর ছেড়ে আঙিনায়, আঙিনা ডিঙিয়ে পথে, পথ থেকে আঁস্তাকুড়ে।

আঁস্তাকুড়ের নোংরায় দাঁড়িয়ে নিমাই হাসছে। আর বলছে, 'এবার ধর তো দেখি।'

মা ধরেন কী করে? ছুঁলে যে গঙ্গায় চান করতে হবে। পারা যায় এমন ছেলেকে নিয়ে?

কিন্তু সেই ছেলে লেখাপড়ায় সবাইকে অবাক করে দেয়।

পাঁচবছর বয়সে হাতেখড়ি হয় নিমাই-এর। একবার দেখেই বর্ণমালার সব বর্ণ শিখে নেয় নিমাই।

সুদর্শন ওঝার পাঠশালায় ভর্তি করা হয় নিমাইকে। সব অক্ষর লিখতে পারে সে। চটপট সব শিখে ফেলে।

নিমাই-এর দাদা বিশ্বরূপ খুব বিদ্বান ছিলেন। নানা শাস্ত্র পাঠ করে তিনি সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান। নিমাইও লেখাপড়ায় খুব ভালো।

বাবা জগন্নাথ মিশ্র ভয় পেলেন। এ ছেলে যদি ঘর ছাড়ে।

নিমাইকে বাবা পাঠশালা থেকে ছাড়িয়ে আনলেন। নিমাই-এর লেখাপড়া বন্ধ। নিমাই আরও দুরন্ত হয়ে ওঠে।

শেষে সবাই মিলে জগন্নাথ মিশ্রকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিমাইকে পাঠশালায় পাঠাবার ব্যবস্থা করে।

নিমাই খুব খুশি।

পাঠশালার পড়া শেষ করে নিমাই ভর্তি হলো গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে। তার আশ্চর্য মেধা লক্ষ্য করে পণ্ডিতমশাই তো অবাক।

অল্পদিনেই নিমাই ব্যাকরণ শাস্ত্র শেষ করে। তারপর একে একে সাহিত্য, অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র। ন্যায় পড়ার জন্য নিমাই যায় মহেশ্বর বিশারদের টোলে। নিমাইয়ের প্রতিভায় তিনিও মুগ্ধ।

ন্যায়ের তর্কে নিমাই মেতে ওঠে। তর্কযুদ্ধে সে একে একে সবাইকে হারাতে থাকে। এমন কি তার অধ্যাপকরাও অনেক সময় পেরে ওঠেন না এই ছোট ছেলেটির সঙ্গে।

হাটে-বাটে কোনও পণ্ডিত বা পড়ুয়া দেখলেই নিমাই তর্ক জুড়ে দেয়। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে থাকে। বাঘা বাঘা পণ্ডিতরাও তখন জব্দ।

দস্যি নিমাই হয়ে ওঠে একটি ক্ষুদে পণ্ডিত।

নবদ্বীপের এই যে দস্যি ছেলে নিমাই, ক্ষুদে পণ্ডিত নিমাই, পরে তিনিই হলেন

প্রেমের ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। তাঁর প্রচারিত ধর্মই বৈষ্ণব ধর্ম। মানুষে মানুষে ভালবাসার ধর্ম। সেই ধর্মে সব মানুষ সমান, উঁচু বা নীচু জাত বলে কিছু নেই।

শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে ভাবের এক বন্যা এসেছিল সারা দেশে। ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সঙ্গীত ও শিল্পের আশ্চর্য উন্নতি হয় ঐ সময়।

আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে নবদ্বীপে তাঁর জন্ম হয়।

এসো, আমরা এই মহাপুরুষকে আজ ভক্তিভরে প্রনাম জানাই।

বোপদেব

তখন ভরদুপুর। পুকুরপাড়ে শানবাঁধানো ঘাটে একটি ছেলে বসে আছে আনমনে। একা।

ছেলেটির মনে আনন্দ নেই।

তার পড়া মনে থাকে না। গুরুমশা'য়ের টোলে সে খুব খারাপ ছেলে। সে নাকি গাধা। তার নাকি নিরেট মাথা।

সেদিন ব্যাকরণ পড়া পারেনি। পিঠে তাই বেত পড়েছে।

গুরুমশাই তাকে সাফ্ কথা জানিয়ে দিয়েছেন, 'তোর মত গাধা ছেলের লেখাপড়া হবে না, তুই আর কাল থেকে আসবি না।'

ছেলেটি টোল থেকে বেরিয়েছে মাথা হেঁট করে। ঘরে ফেরেনি। সেই থেকে পুকুর পাড়ে ঠায় বসে আছে। ঘরে ফেরার ইচ্ছে নেই। ঘরে গেলেও তো কপালে অশেষ দুঃখ। সেই বকুনি, কিল-চড়।

এখন সে কী করবে? কোথায় যাবে? গণ্ডমূর্খ হয়ে বেঁচে থেকেই বা কী লাভ? আচ্ছা, সে কি এতই বোকা যে, তার লেখাপড়া মোটেই হবে না?

দুপুর গড়িয়ে যায়।

মেয়েরা আসে স্নানের ঘাটে। স্নান করতে। দলে দলে। তাঁদের কাঁখে কলসি। জল ভরে তারা কলসি রাখছে ঘাটের পৈঠায়। আর স্নান-টান সেরে যে যার কলসি তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে।

আনমনা হয়ে ছেলেটি দেখছে, আবার দেখছেও না।

হঠাৎ তার নজরে পড়ে, মেয়েরা যেখানে কলসি রাখছে, সেখানকার পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে গর্ত হয়ে গেছে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কলসি রাখতে রাখতে এটা হয়েছে।

আশ্চর্য! মাটির কলসির ঘষা লেগে লেগে পাথরেরও ক্ষয় হয়!

বিদ্যুৎ চমকের মতো একটা চিন্তা এল ছেলেটির মাথায়।

বারবার ঘষা লেগে পাথর যদি ক্ষয়ে যায়, তবে বারবার চেষ্টা করলে তার লেখাপড় হবে না কেন? তার নিরেট মাথাটা কি পাথরের চেয়েও কঠিন?

একদৃষ্টিতে সে পাথরের ওপর গর্তটা দেখতে লাগল।

দেখতে দেখতে সিধে হয়ে বসল।

হ্যাঁ, পারবে। সে নিশ্চয়ই পারবে।

বারবার চেষ্টা করবে সে। দশবার, বিশবার, একশোবার ; যতক্ষণ না হয়, বই ছেড়ে উঠবে না।

মন শক্ত করে ছেলেটি বাড়ির দিকে পা চালায়।

বই পুঁথি নিয়ে সে ঘরে ঢুকে খিল দেয়।

সব ভুলে একমনে পড়তে থাকে। ব্যাকরণের কঠিন কঠিন সূত্র।

পড়া মুখস্ত করে তবে উঠবে। খিদে পেলে খাবে না, ঘুম পেলে ঘুমোবে না।

বন্ধ ঘরে ছেলেটি যেন সাধনায় ডুবে গেল। শুধু পড়া আর পড়া।

সত্যি সত্যি ছেলেটির ব্যাকরণ পড়া তৈরি হলো। মুখস্ত জল হয়ে গেল কঠিন কঠিন সব সূত্র।

হাসি ফুটলো তার মুখে।

পরের দিন সে গেল গুরুমশায়ের টোলে।

'তুমি আবার এসেছ।' গুরুমশায়ের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর।

ছেলেটি গুরুকে প্রণাম করে বিনীতভাবে বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, গুরুদেব। আমার ব্যাকরণ পড়া হয়েছে।'

'তাই নাকি ?' অবিশ্বাসের হাসি ফোটে টোলের গুরুমশায়ের ঠোঁটের এককোণে।

তিনি পড়া ধরলেন।

অবাক কাণ্ড! ছেলেটি সব পড়াই গড়গড় করে বলে গেল।

সন্তুষ্ট হলেন গুরুমশাই। ছাত্রকে আশীর্বাদ করলেন তিনি।

এরপর ছেলেটির আশ্চর্য উন্নতি হলো। সব পড়া তার মনে থাকে। টোলে সে হলো সেরা ছাত্র।

জগতের অসাধ্য বলে কিছু নেই। চেষ্টায় কী না হয় ? ধৈর্য চাই, নিষ্ঠা চাই, সংকল্প চাই, আর চাই মনের জোর, তবেই সব হয়!

সেইদিনের সেই ছেলে, বোকা-গাধা বলে গুরুমশাই যাকে টোল থেকে বের করে দিয়েছিলেন, পরে সেই ছেলেই নিজের সাধনার জোরে হলেন অসাধারণ পণ্ডিত বোপদেব।

বাংলার গৌরব বোপদেব গোস্বামী।

তিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ লেখেন। তাঁর লেখা আরও অনেক বই পুঁথি আছে, বড় বড় পণ্ডিতরাও যা পড়তে গিয়ে হিমসিম খান।

বীরসিংহের সিংহশিশু

আট বছরে ছোট ছেলেটি আনন্দরামের কাঁধে চড়ে কলকাতায় চলেছে।

তখন তো আর এখনকার মত যাতায়াতের এতো সুবিধে ছিল না। তখন না-ছিল ট্রেন, না-ছিল বাস-টাস। পায়ে হেঁটেই দূর পথ পাড়ি দিতে হতো সে সময়।

ছেলেটি কলকাতায় যাচ্ছে মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রাম থেকে। সঙ্গে আছেন তার বাবা আর গাঁয়ের পাঠশালার গুরুমশাই।

বাবা কলকাতায় চাকরি করেন। বাসা নিয়ে সেখানেই থাকেন। ছেলেটি কলকাতার পাঠশালায় ভর্তি হবে, বাবার কাছে থেকে লেখাপড়া শিখবে।

সে কাঁধে চড়ে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে চলেছে। যা দেখে অবাক হয়, 'এটা কী, ওটা কেন' বলে বাবাকে একটার পর একটা প্রশ্ন করে।

'বাবা, রাস্তার ধারে বাটনা-বাটা শিল পোঁতা কেন?'

'দূর বোকা, ওগুলো শিল নয়—মাইল স্টোন।'

'মাইল স্টোন কী বাবা?'

'আমরা কতটা পথ হেঁটে এলুম, ঐ পাথরগুলো দেখে জানা যাবে। প্রতি মাইল অন্তর ও রকম একটা করে পাথর আছে।'

'আচ্ছা বাবা, 'পাথরের গায়ে কী লেখা আছে?'

ছেলেটির প্রশ্নের আর শেষ নেই। সব কিছু সে জানতে চায়। বাবা কিন্তু তাতে বিরক্ত হন না, মাইল স্টোনের গায়ে লেখা ইংরাজি সংখ্যাগুলো তিনি ছেলেকে চিনিয়ে দেন।

ইংরাজি সংখ্যা চিনতে চিনতে আর শিখতে শিখতে ছেলেটি এগিয়ে চলে। এক থেকে দশ পর্যন্ত শেখ হয়ে যায়।

গুরুমশাই তো অবাক। তিনি বললেন, 'এতো সামান্য ছেলে নয়, এ ছেলে একদিন মস্ত বড়মানুশ হবে।'

শুনে ছেলেটির বাবা হেসে বলেন, 'ওর ঠাকুর্দা তো ওকে এঁড়ে বাছুর বলেন। তাঁর নাতিটি নাকি এঁড়ে বাছুরের মতই একগুঁয়ে হবে, বংশের গৌরব বৃদ্ধি করবে।'

বাবার কলকাতার বাসায় পেঁাছলো ছেলেটি।

সেখানে কাছাকাছি এক পাঠশালায় ভর্তি করা হলো তাকে। মাত্র তিনমাসে পাঠশালার সব পড়া তার শেষ। মাত্র আট বছরের ছেলে, কিন্তু কী আশ্চর্য ক্ষমতা! কী বুদ্ধি!

পাঠশালার শিক্ষক বললেন, 'এ ছেলে কালে বিরাট কিছু হবে।'

মাত্র ন' বছর বয়সে তাকে ভর্তি করা হলো সংস্কৃত কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে।

সে কলেজে যা পড়ত, রোজ রাতে বাবাকে মুখস্ত বলে শোনাতো। ফাঁকি চলতো না। পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লে কি আর রক্ষে ছিল, বাবা বেদম পিটুনি দিতেন। ঘুম পেলে চোখে সরষের তেল লাগাতো সে।

সংস্কৃত কলেজেও ছেলেটি ছিল সব থেকে সেরা ছাত্র। ব্যাকরণে তার জ্ঞান দেখে মাস্টারমশাইরাও অবাক হতেন। ছ' মাসের মধ্যে একটি পরীক্ষা হলো। ছেলেটি ফার্স্ট হয়ে পাঁচ টাকা' বৃত্তি পেল।

লেখাপড়ার জন্যে কী কষ্টই না করতো ছেলেটি।

তার কাছে পড়া তো ছিল তপস্যার মতো।

তারপর সাহিত্য-শ্রেণীতে পড়তে চাইল ছেলেটি। তখন তার বয়স মাত্র বারো। অতটুকু ছেলে সংস্কৃত সাহিত্যের কী বুঝবে?

ছেলেটি না-ছোড়। বললে, 'বেশ, আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন।'

অধ্যাপক কালিদাসের সাহিত্য থেকে কঠিন কঠিন সব প্রশ্ন করতে লাগলেন. ছেলেটি ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে গেল।

অবাক কাণ্ড। কালিদাসের সাহিত্য বড়রা সবাই ভালো করে বোঝে না. বারোবছরের ছেলে এত সুন্দর করে গুছিয়ে উত্তর দিল কী করে!

এ তো অসাধারণ ছেলে।

সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক মুগ্ধ হলেন।

ছেলেটি সাহিত্যের ক্লাসে ভর্তি হলো।

দু'বছর সাহিত্য পড়তে হয়। দু'বছরই বার্ষিক পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে ছেলেটি অনেক প্রাইজ পেল।

বারো বছরের ছেলের মুখে নির্ভুল সংস্কৃত শুনে সকলেই অবাক মানতো।

কলকাতার বাসায় শুধু লেখাপড়া নয়, কত কাজ যে তাকে করতে হতো!

রোজ দু'বেলা তিন-চারজনের রান্না করতে হতো। খুব সকালে উঠেই ছুটতে হতো বাজারে। তারপর কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, কাঠ চিরে উনুন ধরানো—সবই করতে হতো সেই বয়সে। রান্না করে সকলকে খাইয়ে নিজে খেত। তারপর বাসন-টাসন মেজে' ঘর-দোর ধুয়ে-মুছে কলেজে যেত।

কত যে কষ্ট করতো সে!

একফালি বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে শুতে হতো তাকে। মাথায় বালিশও জুটত না, আর খাওয়া বলতে মোটা চালের ভাত দুটি দুটি, পরা বলতে মোটা সুতোর খাটো ধুতি ও চাদর।

ছেলেটির বাবা সামান্য মাইনের চাকরী করতেন। খুবই কষ্ট করে চালাতেন তিনি।

এত অভাব, তবু ছেলেটি তার বৃত্তির টাকা থেকে গরিব সহপাঠীদের সাহায্য করত, কারুর বই কিনে দিত, কারুকে দিত জামা-কাপড়। পরের দুঃখ-কষ্ট সে সইতে পারতো না, চোখে তার জল আসতো।

ছেলেটির আরও কত গুণ ছিল।

বাবা-মা ছিলেন তার কাছে দেব-দেবীর সমান। বড়দের সে ভক্তি করতো, ছোটদের ভালবাসত।

দেশে গেলে সে পাঠশালার গুরুমশাইয়ের বাড়ি গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতো। গাঁয়ের এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে সকলের খোঁজ খবর করতো। কারুর অসুখ-বিসুখ হলে ছুটতো তার সেবা করতে।

সকলেই ভালবাসত ছেলেটিকে।

কলেজের অধ্যাপকরা তার পড়াশুনা দেখে ভাবতেন' ছেলেটি বিদ্বান হবে।

হ্যাঁ, শুধু বিদ্বান নয় ; বড় হয়ে সেই ছেলেটিই হলো বিদ্যাসাগর।

যাঁর 'বর্ণপরিচয়' দিয়ে আমাদের লেখাপড়া শুরু হয়—সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শুধু বিদ্যাসাগর নন—দয়ার সাগর বির্দ্যাসাগর।

আমাদের দেশের এক বিখ্যাত কবি তাঁর সম্বন্ধে একটি কবিতায় বলেছেন—

'বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগর বীর'

ক্লাশ থেকে পালিয়ে

ছোট্ট একটি ছেলের গল্প শোনো।

কতই বা বয়স তার, বড় জোর সাত।

সেই সাত বছরের ছেলেটি ইস্কুলে নীচের ক্লাশে পড়ে। লেখাপড়ায় খুব মন। কিন্তু ছোট তো, মজা দেখলে পড়া ফেলে সেদিকেই ছোটে।

একদিন সে ক্লাশে বসে আছে। এমন সময় তার কানে এল ডুগডুগির আওয়াজ।

ছটফটিয়ে উঠে ছেলেটি ক্লাশঘরের জানলায় মুখ বাড়ায়।

রাস্তায় ধারে বাঁদর নাচ হচ্ছে। বাঁদরওলার হাতে ডুগডুগি বাজছে—ডুগ্-ডুগ্ ডুগ্-ডুগ্।

ব্যস, ছেলেটি লাফিয়ে ওঠে। সব ভুলে ক্লাস ছেড়ে বাইরে আসে, পথে ভীড় ঠেলে সোজা বাঁদর নাচের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। আরও কয়েকজন ছেলে তার সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

বাঁদর নাচছে।

ডুগডুগি ডুগ্-ডুগ্ করে বাজছে।

সবাই হাততালি দিচ্ছে।

ভারি মজা!

সেই মজায় ছেলেটির হুঁশ থাকে না।

ভাগ্যিস মাস্টারমশাই তখনও ক্লাসে আসেন নি। কিন্তু আসতে কতক্ষণ?

মাস্টারমশাই ক্লাশে ঢোকার আগেই অন্য ছেলেরা ফিরে আসে। লক্ষ্মী ছেলে হয়ে যে-যার জায়গায় বসে পড়ে।

কিন্তু সেই একটি ছেলের কি ভয়-ডর বলে কিছু নেই, নাকি সে ভুলেই গেছে যে, সে ইস্কুলে পড়তে এসেছে?

কে জানে।

ওদিকে মাস্টারমশাই তো ক্লাশে ঢুকে পড়েছেন। পড়া শুরু হয়েছে। ইংরাজি ক্লাস। মাস্টারমশাই ও খুব কড়া। পড়া না হলে পিঠে বেত পড়ে। ছেলেটি তখনও অবাক হয়ে বাঁদর নাচ দেখছে।

একসময় নাচ শেষ হয়। ডুগ-ডুগির ডুগ্ ডুগ্ শব্দ থেমে যায়। শেখানো-বাঁদর পয়সার জন্যে সকলের পা ধরে।

ছেলেটির হুঁশ ফিরে আসে।

মাস্টারমশাই তো ক্লাশে এসেছেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে ছেলেটি তার কোনও বন্ধুকেই দেখতে পায় না।

সর্বনাশ! কী হবে এখন?

মাথা নীচু করে ছেলেটি ক্লাসে ঢোকে।

মাস্টারমশাই রাগে গরগর করে ওঠেন, 'এই যে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

'বাঁদর নাচ দেখছিলুম, স্যার?'

'বাঁদর নাচ! ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বাঁদর নাচ দেখা হচ্ছিল? তা আবার ক্লাশে কেন, তুমি নিজেই তো একটা আস্ত বাঁদর। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে রাস্তায় রাস্তায় নেচে বেড়ালেই তো হয়।'

ছেলেটি বেঞ্চিতে তার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে। ইংরাজি বই খুলে পড়া তৈরি করে।

এক ঘণ্টা পরে ছেলেটি উঠে দাঁড়ায়।

'সার, আমার পড়া হয়েছে।'

'কই দেখি, কতটা পড়া হলো।'

ছেলেটি উঠে গিয়ে বই খুলে দেখায়—ক' পাতা সে পড়েছে।

মাস্টারমশাই হিসেব করে দেখলেন, ছেলেটি পর পর অনেকগুলো পাতা যা পড়েছে বলছে, তা কম করেও সাত দিনের পড়া।

সাতদিনের পড়া এক ঘণ্টায়?

অসম্ভব!

ছেলেটি মিছে কথা বলছে ভেবে মাস্টারমশাই তো রেগে আগুন।

'লেখাপড়া কি এতই শস্তা যে, সাতদিনের পড়া একনিঃশ্বাসে একঘণ্টায় হয়ে যাবে? আচ্ছা, সব পড়াই ধরছি, না-পারলে কিন্তু পিঠের ছাল তুলে নেব আজ।'

মাস্টারমশাই ইংরিজি পড়া ধরলেন, পাতার পর পাতা।

আশ্চর্য! ছেলেটি সত্যিই ঠিক ঠিক পড়া বলল।

সাত দিনের পড়া সে মাত্র একঘণ্টায় তৈরি করেছে।

মাস্টার মশাইয়ের সব রাগ জল হয়ে যায়। তিনি খুশি হয়ে ছেলেটির পিঠ চাপড়ে বাহবা দেন।

মাস্টারমশাই বুঝতে পারেন, এ সামান্য ছেলে নয়, বড় হয়ে এ ছেলে অনেক বড় কাজ করবে।

মাস্টারমশাই ঠিকই চিনতে পেরেছিলেন সেই অসাধারণ ছোট্ট ছেলেটিকে। বড় হয়ে সেই ছেলেটিই হলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ক্ষুদে মাস্টারমশাই

জোড়াসাঁকোয় মস্ত বাড়ি তাদের। বাড়ি তো নয়, সে যেন তিনমহলা রাজপ্রাসাদ।

একটি মহল চাকর-বাকরদের। সেখানেই অনেকটা সময় রবিকে থাকতে হয়। চাকরদের হাতেই তার দেখাশোনার ভার।

সেখানে ছোট্ট রবি নজরবন্দী। নড়াচড়ার উপায় নেই। ইচ্ছেমত বাইরে যাওয়া একেবারেই বারণ।

একটি চাকরের নাম শ্যাম। সে করত কি, একজায়গায় রবিকে বসিয়ে রেখে তার চারদিকে খড়ি দিয়ে দাগ কেটে বলে যেত, 'খুব সাবধান! এই গণ্ডির বাইরে একদম যাবে না, তাহলে আর রক্ষে নেই, বিষম বিপদে পড়বে।'

রবি সরল মনে তা বিশ্বাস করত। সে রামায়ণের গল্প শুনেছে। গণ্ডীকে অবহেলা করার সাহস তার হতো না। ভাবত, দাগের বাইরে পা বাড়ালে সীতার মতোই বিপদে পড়বে সে।

একা একা কত কী ভাবে রবি। আপনমনে খেলা করে।

বারান্দার সারি সারি রেলিংগুলো হয় ছাত্র, রবি তাদের বেত হাতে কড়া গুরুমশাই।

ছাত্রদের কোন-কোনটা মহা দুষ্টু। আর এমন গাধা যে, পড়া মুখস্ত করতে পারে না। রবি বেত উঁচিয়ে তাদের ধমক-ধামক দেয়, পড়তে বাধ্য করে। রেলিংগুলোর গায়ে-পিঠে গুরুমশাইয়ের বেত পড়ে, ঠক্ ঠক্ শব্দ হয়।

সাবেক কালের একটা পাল্কী ছিল। সেটা সারাদিন সেখানেই পড়ে থাকত।

রবি সেই পাল্কীতে উঠে চুপচাপ বসে থাকে।

পাল্কীটা যেন ছোট এক নির্জন দ্বীপ। তার চারদিকে ঢেউ-তোলপাড় অকূল সমুদ্দুর। রবি যেন সেই দ্বীপে রবিনসন ক্রুশোর মতোই একা, ঠিকানা-হারানো।

বাইরে বাগান। তার ওদিকে পুকুরঘাট। ঘাটের ধারে ঝুরি-নামানো প্রকাণ্ড

বটগাছ। রবি সারা দুপুর জানালার খড়খড়ি তুলে সে-দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে।

কত লোক আসে। কেউ জল নেয়। কেউ স্নান করে। আসে আর যায়।

বটগাছটার কতো ঝুরি। তার নীচেটা কেমন ছায়া-কালো-কালো, আঁধার-আঁধার। বড় হয়ে ছোট্ট রবি সেই বটগাছটিকে ভুলতে পারেনি, লিখেছিল ঃ

নিশি-দিশি দাঁড়িয়ে আছ মাথায় লয়ে জট
ছোট্ট ছেলেটি, মনে কি পড়ে ওগো প্রাচীন বট ॥

কখনও বা রবির মন কল্পনার পাখা মেলে উধাও হয়ে যায় আকাশে। সেখানে মেঘের পেছনে সে ছোটে। মেঘের আকার পাল্টায়, রঙ পাল্টায়। রবি কখনও রাজপুত্তুর। উড়ো মেঘ তার পক্ষিরাজ ঘোড়া।

কখনও আবার পুরুতঠাকুর হয় রবি। সিঙ্গিবলি দেয়। কাঠের সিঙ্গিটার গলা যেন এককোপে সে কেটে ফেলে, ঘ্যাঁচাৎ করে। আর সিঙ্গিবলির মন্তরটাও ভারি মজার ঃ

সিঙ্গিমামা কাটুম
আন্দিবোসের বাটুম
উলকুট ঢুলকুট ঢ্যাম কুড়কুড়
আখরোট বাখরোট খট্ খট্ খটাস্
পট্ পট্ পটাস্ ॥

রবি ছড়া শুনতে খুব ভালবাসে।

খাজাঞ্চী কৈলাশ মুখুজ্যে তাকে অনেক কবিতা ছড়া শোনায়। ছন্দের দোলায় দুলে ওঠে তার মন।

পড়ার বইয়ের একটি পড়া সে বারবার পড়ে। সেই যে—জল পড়ে পাতা নড়ে।, পড়তে পড়তে তার মাথা নড়ে, মন দোলে। পড়ার পরেও তার কানের কাছে গুণগুণ করে—জল পড়ে পাতা নড়ে।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান—এ ছড়াও রবিকে আনমনা করে দেয়।

রবির বয়স যখন সাত-আট, ভাগ্নে জ্যোতিপ্রকাশ তাকে কবিতা লিখতে শেখায়। ভাগ্নে হলে কি হবে, বয়সে সে রবির চেয়ে বড়।

ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে জ্যোতিপ্রকাশ একদিন রবিকে বলে, 'এসো, তোমাকে কবিতা লিখতে শেখাই।'

সেই শুরু।

রবির খুব উৎসাহ। সে একটা নীল কাগজের খাতা বানায়। তাতে পেন্সিলে রুল টেনে, কাঁচা হাতের গোটা গোটা অক্ষরে সে কবিতা লিখতে শুরু করে। কতো কবিতা লেখে ক্ষুদে কবি।

রবি যখন ইস্কুলে ভর্তি হয়, সেখানেও পৌঁছে যায় তার কবিতা লেখার খবর।

নর্ম্যাল ইস্কুলে সাতকড়ি মাস্টার রবিকে পরীক্ষা করবার জন্য তার খাতায় দু'লাইন লিখে দিলেন—

রবিকরে জ্বালাতন আছিল সবাই।
বরষা ভরসা দিল আর ভয় নাই ॥

পরের দিন রবি বাকি অংশটুকু লিখে নিয়ে এল। সাতকড়ি মাস্টার অবাক হয়ে পড়লেন—

মীনগণ হীন হয়ে ছিল সরোবরে।
এখন তাহারা সুখে জলক্রীড়া করে ॥

রবির নীলখাতায় অনেক মজার মজার ছড়া লেখা ছিল। যেমন একটি—

আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলি দলি
সন্দেশ মাখিয়া দিয়া তাতে—
হাপুস্ হুপুস্ শব্দ চারিদিক নিস্তব্ধ
পিঁপিড়া কাঁদিয়া যায় পাতে ॥

সেই ছোট্ট রবি, ক্ষুদে কবিই তো বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কি, কেমন লাগলো কবিদাদুর ছেলেবেলার গল্প?

পড়ুয়া

সে এক পড়ুয়া ছেলে। তার বয়স তের কি চোদ্দ বছর।

ছেলেটির খালি পড়া আর পড়া। তার খেলায় মন নেই, খেয়াল বলেও কিছু নেই, অন্য ছেলেদের মতো নানা বায়নাক্কাও নেই।

ছেলেটি শুধু পড়তে ভালবাসে।

এমন আশ্চর্য ছেলে ভূ-ভারতে দেখেছে কেউ ?

সবাই যখন রাতে ঘুমিয়ে পড়ে, সে তখন একা জেগে থাকে বই মুখে করে। অনেক রাত অবধি জেগে বই পড়ে।

অন্য ছেলেরা পড়তে চায় না বলে বাবা-মা'র বকুনি খায়, এ ছেলেটি এত বেশী পড়ে যে তার বাবা বকাবকি করেন।

বাবা একদিন ছেলেকে বললেন, 'সব সময় পড়বে না, তাতে শরীর ভেঙে পড়বে। আর রাত অবধি জেগে পড়াশুনোর কী দরকার ? সকাল সকাল শুয়ে পড়বে, বুঝলে ?'

বাবার কথায় বাধ্য হয়ে ছেলেটি ঘাড় নাড়ে বটে, কিন্তু তার মন মানতে চায় না।

ঘুমের ভান করে সে চুপটি করে বিছানায় শুয়ে থাকে, অপেক্ষা করে—কখন বাবা ঘুমিয়ে পড়েন। বাবা ঘুমোলেই উঠে বসে, নিঃসাড়ে বই খুলে পড়া শুরু করে।

এ ভাবেই চলতে থাকে।

খুব বেশি পড়াশুনা করে ছেলেটি রোগা হতে থাকে, শেষপর্যন্ত সত্যিই সে অসুখ বাধিয়ে বসে।

ডাক্তারবাবু এলেন।

ছেলেটিকে পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু গম্ভীর হয়ে তার বাবাকে বললেন, 'খুব বেশি পরিশ্রম করে ছেলেটির এই হাল হয়েছে। এত পড়লে যে মাথা খারাপ হয়ে যাবে ? এখন কিছুদিন ওর লেখাপড়া বন্ধ থাক। পুরোপুরি বিশ্রাম দিন ওকে।'

কিন্তু কে বিশ্রাম দেবে তাকে ?

ফাঁক পেলেই সে বই নিয়ে বসে। ডাক্তারবাবুর নিষেধ মানতে তার যেন ব'য়ে গেছে।

বাবা ভয় পান। বলেন, 'পড়া পড়া করে তুই কি মরতে চাস?'

ছেলেটি ঘাড় হেঁট করে থাকে।

পড়া যেন তার নেশা, সে নেশা ছাড়ায় কার সাধ্যি?

বাবা তখন বাধ্য হয়ে পড়ুয়া ছেলেকে একটা ঘরে তালা বন্ধ করে আটকে রাখলেন। সে ঘর থেকে তার সমস্ত বই-খাতা সরিয়ে ফেললেন। মনে মনে তিনি বললেন, 'দেখি এবার ছেলে কেমন করে পড়ে।'

কয়েক ঘণ্টা পর ঘরের তালা খোলা হলো, ছেলেটির খবর নিতে।

বাবা ভেবেছিলেন, বাধ্য হয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুনছে শ্রীমান।

কিন্তু ও হরি! গুণধর ছেলে এ কী কাণ্ড করেছে? ঘরের দেয়াল ভরে ফেলেছে জ্যামিতির ছড়ি এঁকে। একটুকরো কয়লা দিয়ে এতক্ষণ জ্যামিতির পড়া করছিল সে।

এমন পড়ুয়া ছেলে লেখাপড়ায় তো ভালো হবেই। তাকে পাঁচ বছর বয়সে শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে ছ' বছরের পড়া সে দু'বছরে শেষ করে।

বাবা তাকে বেশি বেশি পড়ার জন্যে বকাবকি করতেন তার শরীর-স্বাস্থ্যের কথা ভেবে। কিন্তু ছেলেকে তিনি ভালমত লেখাপড়া করার জন্যে খুবই উৎসাহ দিতেন। খুশিও হতেন ছেলের আগ্রহ দেখে।

বাবা তাকে বলতেন, 'তুমি যতদিন ক্লাশে ফার্স্ট বয় হয়ে থাকবে, তোমাকে আমি রোজ একটা করে টাকা দোব। আর সেকেণ্ড হলে দোব আট আনা করে।'

তা সে ছেলে কখনো সেকেণ্ড হয়নি, বরাবরই ফার্স্ট।

বাবা প্রায়ই ছেলেকে উপদেশ দিতেন, 'যা শিখবে ভালো করে শিখবে।'

ছেলেটি সব সময়েই ভালো করে সব কিছু শিখত। পড়ার বিষয় যতক্ষণ না মাথায় ঢুকতো, ছাড়তো না।

বাবা সেই অতটুকু ছেলেকে বক্তৃতা দেওয়া শেখাতেন।

একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে সে চেঁচিয়ে যে কোনও বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দিত, আর বাবা একমাত্র শ্রোতা হয়ে শুনতেন।

ছেলেটি একটু বড় হয়ে কলেজে পড়তে গেল।

এবার তার কলেজজীবনের একটা ঘটনা বলি।

সাহেব অধ্যাপক গ্রীক পুরাণ পড়াচ্ছেন। একপাতা পড়ে তিনি ছাত্রদের শোনালেন। তারপর লিখতে দিলেন।

লেখা হতে ছাত্ররা একে একে উঠে এসে খাতা দেখাতে লাগল। অধ্যাপক ভুল শুধরে দিতে লাগলেন।

সেই পড়ুয়া ছেলেটির খাতা দেখে স্যার তো রেগে অগ্নিশর্মা।

'বই দেখে লিখেছ কেন? হুবহু মিলে যাচ্ছে, একেবারে কমা ফুল্‌স্টপ পর্যন্ত, ব্যাপার কী?' প্রচণ্ড ধমক দিয়ে স্যার বললেন।

ছেলেটি তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'স্যার, আমার কাছে তো বইটা নেই, নকল করব কী করে?'

'তবে বইয়ের সঙ্গে সব মিলে যাচ্ছে কেন ?'

'আমি একবার যা শুনি, তার সবটাই আমার মনে থাকে স্যার।'

'বেশ, তবে যা শুনেছ মুখে মুখে বলে যাও, তাহলে বুঝব তুমি নকল করোনি।'

সত্যিই ছেলেটি একটু আগে অধ্যাপকের মুখে শোনা গ্রীক পুরাণের সেই একপাতা গড়গড় করে মুখস্ত বলে গেল।

এই অসাধারণ পড়ুয়া ছেলেটিই বড় হয়ে হলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

হ্যাঁ, ইনিই সেই বাংলার বাঘ আশুতোষ।

ধন্যি ছেলে

সে এক ধন্যি ছেলে। তার দস্যিপনায় বাড়িসুদ্ধু লোক সবাই তটস্থ—কখন যে কী করে বসে তার ঠিক নেই।

মাটির শিবঠাকুর গড়ে ঠাকুমা পুজো করছেন, ছেলেটি তীর্থের কাকের মতো বসে আছে—কখন ঠাকুরমার ধ্যান ভাঙবে, পুজো শেষ হবে।

শিবঠাকুরটি যে গুণধর নাতিটির প্রতিদিনের পাওনা।

কিন্তু সেদিন ঠাকুরমার পুজো যেন আর শেষ হতেই চায়না। অধীর হয়ে ওঠে দস্যি ছেলেটি। উসখুস করতে থাকে। তারপর একসময় খপ্ করে শিবঠাকুরটি তুলে নিয়েই চম্পট।

ঠাকুমার ধ্যান ভাঙে। চোখ মেলে দেখেন ঠাকুর অদৃশ্য। কী হলো? কে নিল? নেবে আর কে, এ নিশ্চয়ই সেই ক্ষুদে শয়তানটার কীর্তি।

কী দস্যি ছেলে রে বাবা! ঠাকুর-দেবতাকে পর্যন্ত ভয় নেই এতটুকু!

ঠাকুমা ভয়ে কাঁটা। ব্রাহ্মণ ভোজন করিয়ে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত্য করতে হলো।

আর একদিন হয়েছে কি, মা খুব বকুনি দিয়েছেন দুষ্টুমি করেছে বলে, অমনি সে লুকলো এক ঝোপের আড়ালে। সেই ঝোপে নাকি ক'দিন আগে বাঘ বেরিয়েছিল।

একেবারে বাঘের পেটে না গেলে কি আর মাকে জব্দ করা যাবে? মা ডেকে ডেকে সাড়া পাবেন না, কেঁদে কেঁদে সারা হবেন।

কেমন জব্দ হবেন মা!

মা কিন্তু একটিবারও ডাকলেন না। খোঁজ খোঁজ করে কেউ ছুটেও এল না সেই বন-বাদাড়ে।

কী ব্যাপার?

আরে, তাই তো, মাকে যে আজ রাগ দেখিয়ে বলেই আসা হয়নি যে সে লুকোতে যাচ্ছে ঝোপের আড়ালে!

কী আর করে, রাগ-মান ভুলে গুটি গুটি করে আবার বাড়ি ফিরে আসে দুষ্টু ছেলেটি। তখন নিজেই সে জব্দ।

শুধু কি দস্যিপনা? মাথার মধ্যে তার 'কেন'র পোকাগুলো যদি একবার কিলবিল করে ওঠে তবে আর রক্ষে নেই। বকিয়ে বকিয়ে মাথা ধরিয়ে তবে ছাড়বে।

বাবা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কত কাজ তাঁর। কত দায়-দায়িত্ব। সারাদিন

খেটেখুটে ক্লান্ত অবসন্ন দেহে তিনি যখন বিশ্রাম নিতে যান, তখনই শুরু হয় ছেলের বকবকানি। 'এটা কী, ওটা কেন' করে অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রশ্ন। একটার পর একটা।

বাবা কিন্তু একটুও বিরক্ত হন না। সমস্ত প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেন।

একদিন ছেলেটি বললে, 'জানো বাবা, আজ সন্ধেবেলায় আমি একরকম মাছি দেখেছি। মাছিটা খালি জ্বলছে আর নিভছে। কেন বাবা?'

বাবা হেসে বললেন, 'মাছি নয় রে বোকা, ও তো জোনাকি।' বলে তিনি জোনাকির ব্যাপারটা সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলেন কৌতুহলী ছেলেকে। হাঁ করে সব শুনল ছেলে। জোনাকির জ্বলা-নেভার রহস্য জলের মতো পরিস্কার হয়ে গেল তার কাছে।

মাঝে মাঝে এমন সব উদ্ভট প্রশ্ন করে বসে ছেলে যে, অমন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বাবাও তার উত্তর দিতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যান। তখন তিনি বলেন, সব প্রশ্নের উত্তর মানুষ এখনও পায়নি, অনেক কিছুই আমরা এখনও জানিনা। বড় হয়ে তোমরা সে-সব জানার চেষ্টা করবে।

সত্যি, অনেক কিছুই মানুষ জানেনা। জানতে হবে। আর তার জন্যেই তো মানুষের সাধনা। নয় কি?

বড় হয়ে সেই দস্যি ছেলেটি সাধনার বলে এমন অনেক কিছু জেনেছিল, যা মানুষ আগে সত্যি-সত্যিই জানত না!

সেই দস্যি ছেলেটিই বড় হয়ে হলেন মস্ত বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর স্মরণে বলেছিলেন, 'আচার্য জগদীশচন্দ্রের প্রতিটি আবিস্কারের জন্যে স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।'

আমাদের দেশের একজন সত্যিকারের বড়মানুষের ছোটবেলার গল্প তোমরা শুনলে। তোমরা যত বড় হবে, ততই জানবে যে, বিজ্ঞানসাধনায় তিনি মানুষের সভ্যতাকে কত কী দিয়ে গেছেন।

ডানপিটে

দত্তবাড়ির ঠাকুরদালানে ছেলেরা খেলছে। কী খেলা? রাজা-রাজা খেলা।

সিঁড়ির সবচেয়ে উঁচু ধাপে রাজার সিংহাসন। নীচের ধাপগুলোয় কেউ মন্ত্রী, কেউ সেনাপতি, কেউ বা কোটাল।

'মহারাজ, রাজ্যে এক দস্যু বড় উৎপাত শুরু করেছে।' মন্ত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বলে।

'এখুনি সেই দস্যুকে বেঁধে আনা চাই। হ্যাঁ, আমার হুকুম।'

যে ছেলেটি দস্যু সেজে ছিল, সে তখন ভোঁ দৌড় দেয়।

অমনি 'ধর ধর' বলে অন্য ছেলেরা সেই দস্যুর পিছু ধাওয়া করে।

সে ভারি মজার খেলা।

রাজা হয়ে যে ছেলেটি সিংহাসনে রাজার মতই বসেছিল, তার নাম বীরেশ্বর। মুখে মুখে সেই নামটাই হয়ে দাঁড়ালো বিলে।

বিলে ভারি দুরন্ত ছেলে। মা তাকে নিয়ে নাকাল হয়ে যান। কী যে জ্বালায় বিচ্চু ছেলেটি!

মা দুঃখ করে বলেন, 'শিবের কাছে চেয়েছিলুম ছেলে, তিনি দিলেন একটা ভূত।'

বিলে ছেলের দলের সর্দার। তাদের নিয়ে সে পাড়াময় টৈ টৈ করে বেড়ায়।

পাড়ার এক বুড়োদাদুর বাগানে ছিল একটা চাঁপাগাছ। বিলের দল সেই চাঁপাগাছে ওঠে। গাছের ডালে পা আটকে বাদুড়ের মতো ঝোলে। দোল খায়।

বুড়োদাদু মানা করেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা? তিনি চোখের আড়াল হতেই বিলের দলবল টপাটপ আবার গাছে উঠে পড়ে।

এ তো ভারি বিপদ। দস্যি ছেলেটা তো চাঁপাগাছটাকে আর আস্ত রাখবেনা।

বুড়োদাদুর মাথায় একটা মতলব এল। তিনি একদিন ছেলেদের ডেকে ভয় দেখালেন। বললেন, 'তোমরা কি জানো, ঐ চাঁপাগাছে একটা ব্রহ্মদত্যি থাকে? খবর্দার, আর কেউ উঠোনা ঐ গাছে, কোন্‌দিন দেবে ঘাড় মটকে।'

ছেলেরা ভয় পায়। না, বাবা, তারা আর ভুলেও চাঁপাগাছের ধারে-কাছে যাবে না।

সেদিনই বিকেলে ছেলের দলে নরেনকে দেখা গেল না। সন্ধে হলো। যে যার ঘরে ফিরবে। কিন্তু বিলে কোথায়?

বিলেকে খুঁজতে বেরোয় ছেলেরা।

তারা দূর থেকে চাঁপাগাছটার দিকে তাকায়। কাছে যাবার সাহস হয় না তাদের।

হঠাৎ বিলের গলা শোনা যায়।

'এই যে আমি এখানে?'

'কোথায় রে কোথায়?'

'এই তো চাঁপাগাছে দোল খাচ্ছি। তোরা আয় না।'

কী সাংঘাতিক! ভরসন্ধে বেলায় ব্রহ্মদত্যির বাসায় বিলে একা একা দোল খাচ্ছে? বাপ্‌রে বাপ, যদি পট্ করে ঘাড়টি মট্‌কে দেয়!

বিলে হাসতে হাসতে গাছ থেকে নেমে আসে। বলে, 'কোথায় রে ব্রহ্মদত্যি? আমি যে তার টিকিটাও দেখতে পেলুম না।'

এই হলো বিলে। ভয় দেখিয়ে তাকে ভোলানো যায় না। চোখ রাঙিয়ে বশ করা যায় না।

বিলের আর একরকম মজার খেলা ছিল। সেটা তার খুবই প্রিয় খেলা। মাঝে মাঝে সে বন্ধুদের নিয়ে ছাদে উঠে যায়। সেখানে তারা চোখ বুজে ধ্যান-ধ্যান খেলায় মেতে ওঠে।

একদিন ছাদের ছোট ঘরে তারা চোখ বুজে ধ্যান করছে। এমন সময় একটি ছেলে চোখ খুলেই দেখে, একটা সাপ ফণা তুলে আছে।

'সাপ! সাপ!' ছেলেটি ভয়ে চিৎকার করে ওঠে। তাই শুনে দুদ্দাড় করে ছুটে পালায় ছেলেরা।

বিলে কিন্তু পালায় না। চোখ বুজে সে বসেই থাকে। ডাকাডাকিতেও তার ধ্যান ভঙ্গ হয় না।

মা ছুটে এলেন। বাবাও এলেন।

সাপ ফণা গুটিয়ে সুড়সুড় করে সরে গেল, বিলের কিছুই হলো না।

বিলের সবকিছুই যেন অন্য রকম।

ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানকে তার খুব পছন্দ। অমন তেজী ঘোড়াগুলোকে কেমন বাগে রাখে লোকটা, তার হুকুমে ঘোড়া গাড়ি টানে, এ কি চাট্টিখানি কথা?

বাবা শুধোন, 'হ্যাঁ রে বিলে, বড় হয়ে তুই কী হবি রে?'

বিলে উত্তর দেয়, 'আমি কোচয়ান হবো, বাবা।'

বীর হনুমানকেও খুব ভালো লাগে বিলের। কথকঠাকুর রামায়ণ গান করেন।

বিলে তাঁকে জিগ্যেস করে, 'ঠাকুরমশাই, হনুমানের দেখা পাবো কোথায় ?'
কথকঠাকুর হেসে বলেন, 'কলাবাগানে।'

বিলে বিশ্বাস করে। রাত হলে কলাবাগানে গিয়ে বসে রইল বিলে। অন্ধকারে মশার কামড় খেয়ে কতক্ষণ অপেক্ষা করল বিলে, কিন্তু কোথায় হনুমান ? তার ল্যাজের ডগাটাও যে চোখে পড়ল না।

কান্না পায় বিলের। তার দুঃখের কথা মাকে জানায়। মা বলেন, 'হনুমান বোধ হয় রামচন্দ্রের কাজে ব্যস্ত আছেন, তাই আসতে পারেন নি।'

বিলের আবার বুদ্ধি খুব। শহরে গ্যাসবাতি জ্বলত। বিলে ভাবল, সে নিজে ঐ রকম গ্যাসবাতি তৈরি করে আলো জ্বালাবে।

ব্যস কাজ শুরু হয়ে যায়। একটা মাটির হাঁড়ি আর চাট্টি খড় জোগাড় করে বিলে। তারপর হাঁড়ির মধ্যে খড় ভরে আগুন জ্বালায়। আর হাঁড়ির মুখে লাগায় একটা নল। ঐ নল দিয়ে ধোঁয়া উঠতে থাকে আকাশের দিকে। বিলে অনেক আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে—গ্যাস তৈরি হচ্ছে, এবার জ্বলবে।

বিলেটা সত্যিই ভারি অদ্ভুত।

ভিখিরি দেখলেই হাতের কাছে যা পায় দিয়ে দেয়। ঘর থেকে কাপড়-চোপড়, থালা-বাসন কত যে গেল তার শেষ নেই। বকে-ঝকেও কিছু হয় না, বিলের দান-ধ্যান চলতেই থাকে। ভিখিরির সাড়া-শব্দ পেলে মা তাকে দোতলার ঘরে বন্ধ করে রাখতেন। একদিন সেই ঘরের জানালা থেকে দামী দামী জামা-কাপড় নীচে ফেলতে লাগল বিলে, আর ভিখিরিরা কুড়িয়ে নিয়ে 'রাজা হও বাবা' বলে চলে গেল খুশি মনে।

বাবা বিশ্বনাথ দত্তের বৈঠকখানায় সারি সারি হুঁকো সাজানো থাকত। কোনটা বামুনের, কোনটা শূদ্রের, আবার কোনটা মুসলমানদের জন্যে। বিলে একদিন চুপি চুপি ঢুকল সেই ঘরে। তারপর এক এক করে সব কটা হুঁকো টানতে লাগল।

হঠাৎ বাবা ঘরে ঢুকলেন। বিলের কাণ্ড দেখে তিনি তো অবাক।

'এই বিলে, এসব হচ্ছে কি?' বাবা ধমক দিয়ে বলেন।

বিলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'কিছু না, বাবা। দেখছিলুম জাত কি করে যায়।'

বিলে একদিন মেলা দেখে নাচতে নাচতে ফিরছে। তার হাতে একটা মাটির মহাদেব। সে মহাদেবের পূজো করবে।

হঠাৎ এক বন্ধু ঘোড়ার গাড়ির সামনে ছিটকে পড়ে। 'গেল গেল' বলে চেঁচিয়ে ওঠে যত রাস্তার লোক।

এই বুঝি ছেলেটি চাকার তলায়...

বিলে একলাফে ছেলেটিকে ঘোড়ার পায়ের কাছ থেকে টেনে আনে, চোখের পলক না ফেলতে।

বিলের বন্ধুটি বেঁচে গেল।

সব শুনে মা বললেন, 'এই তো মানুষের মতো কাজ। সব সময় এমন কাজ করবি, বাবা।'

আট বছর বয়সে বিলে ভরতি হলো বিদ্যাসাগরের ইস্কুলে। সেখানে তার নাম লেখানো হলো—শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত।

হ্যাঁ এই নরেন্দ্রনাথই হলেন বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ। আজ তোমরা তাঁর খুব ছোট বেলার গল্প শুনলে। বড় হয়ে আরও বেশি করে জানবে—বিবেকের বাণী কেমন করে জগৎময় ছুটেছিল, কী ভাবে তিনি 'ওঠ জাগো' বলে আমাদের জাগিয়ে দিয়ে আলোর রাজ্যের পথ চিনিয়ে গেছেন।

নিজেই ইতিহাস

ইতিহাসের পিরিয়ড।

ছেলেরা অপেক্ষা করছে ক্লাসে। স্যার তখনও আসেননি।

এমন সময় একটি ছেলে হনহন করে ক্লাশে ঢুকল। কারুর দিকে সে তাকাল না, বইখাতা টেবিলে রেখে বেঞ্চির ওপর উঠে দাঁড়াল।

ক্লাশের অন্য ছেলেরা তার কাণ্ড দেখে অবাক।

কে তাকে বেঞ্চির ওপর দাঁড়াতে বলছে? কী দোষ করেছে সে? স্যার তো এখনো ক্লাশেই আসেন নি। তবে?

ছেলেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে। কিন্তু তাকে কিছু জিগ্যেস করার সাহস হয়না।

ছেলেটা বড় একগুঁয়ে।

স্যার ক্লাশে ঢুকলেন। বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে-থাকা ছেলেটির দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ।

ইতিহাসের স্যার খুব কড়া, খুব রাগী। ছেলেরা সবাই ভয় করে তাঁকে। ফাঁকি চলেনা তাঁর কাছে। পড়া না-পারলে শাস্তি পেতেই হবে।

স্যার গম্ভীর হয়ে ছেলেটিকে বললেন, 'কি ব্যাপার, আগে থেকেই বেঞ্চির ওপর দাঁড়িয়ে যে?'

'আজ আমার ইতিহাস পড়া হয়নি, স্যার। পড়া না-হলে আপনি তো বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দেন। আমি তাই আগে থাকতেই দাঁড়িয়েছি।' ছেলেটি শান্ত হয়ে জবাব দেয়।

ইতিহাসের স্যারের গম্ভীর মুখে হাসি ফোটে। এমন ছাত্রও তাহলে আছে ইস্কুলে। তিনি হাসতে হাসতে বলেন, 'বাঃ ভাল কথা, নিজেই নিজেই শাস্তির ব্যবস্থা করেছ দেখছি। তা পড়া কেন হয়নি জানতে পারি?'

ছেলেটি বলে, 'যা বলব তা কি বিশ্বাস করবেন, স্যার?'

ছাত্রের প্রশ্নে স্যার তো হতবাক। ভয় নেই এতটুকু, উল্টে তাঁকেই প্রশ্ন করছে—বিশ্বাস করবেন কিনা!

ছেলেটির মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে স্যার বলেন, 'আর কেউ বললে বিশ্বাস করব না, তবে, তোমার কথা করব। এবার বলো কী হয়েছিল?'

ছেলেটি তখন ধীরে ধীরে বলতে থাকে, 'আমাদের পাড়ায় এক মুড়িউলির কলেরা হয়েছিল, স্যার। তার কেউ নেই। কে ডাক্তার ডাকে, কে বা সেবা-শুশ্রূষা করে। কাল সারাটা রাত স্যার সেই বুড়ির ঘরেই ছিলুম। সকালেও ছিলুম সেখানে। বুড়ি এখন একটু ভালো আছে। তাই ইস্কুলে আসতে পেরেছি। কিন্তু ইতিহাস পড়া করার সময় পাইনি, স্যার।'

সব শুনে স্যার অবাক হলেন। ছাত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি যেন তার ভবিষ্যত পড়ে ফেললেন।

অমন কড়া আর রাগী মাস্টারমশাই, কিন্তু তাঁর গলা ধরে এলো কথা বলতে গিয়ে। তিনি বললেন, 'তুমি নেমে বসো, বাবা। আমি আর তোমাকে কি ইতিহাস পড়াবো? তুমি নিজেই একদিন ইতিহাস তৈরি করবে।'

এই ছেলেটিকে নিয়ে আর একটি গল্প, শোনাবো তোমাদের। বানানো গল্প নয়, সত্যি গল্প!

নদীর ওপারে বুড়োশিবের মন্দির। ঘন বনের আড়ালে!

একদিন সেই মন্দিরে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে ছেলেটি। পাশ দিয়ে চলে যায় বিষধর সাপ, কোনো হুঁশ নেই।

সারা তল্লাট জুড়ে কোথাও ছেলেটির দেখা পেলেন না তার মাস্টারমশাই। কে যেন বলল, 'কাঁসাই পেরিয়ে ঐ ওপারের জঙ্গলে তাকে যেতে দেখেছি।'

বুড়োশিবের মন্দিরে ছেলেটির দেখা পেলেন মাস্টারমশাই। ডেকে তুললেন তাকে; বললেন, 'কী চাস তুই?'

ছেলেটি জবাব দিল, 'চাই ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াতে, তাই ঠাকুরকে ডাকছি।'

'তবে আয় তুই আমার সঙ্গে।' ডাক দিয়ে বললেন মাস্টারমশাই।

কাঁসাই নদীর ধারে নির্জন বনে আছে এক পোড়ো বাড়ি, সবাই বলে ভূতের বাড়ি।

একদিন সেই ভূতের বাড়িতেই মাস্টারমশাইকে ঢুকতে দেখা গেল, সঙ্গে সেই ছেলেটি।

ভেতরে ঢুকে অন্ধকার ঘরে কালীমূর্তির সামনে গিয়ে মাস্টারমশাই বললেন 'মাকে প্রনাম কর।'

মাটিতে লুটিয়ে পড়ে ছেলেটি।

তিনটি বেলপাতা তার হাতে তুলে দিয়ে মাস্টারমশাই আদেশ করেন, 'ঐ দেখ মায়ের পায়ের কাছে পড়ে আছে শানিত কৃপান, ঐ কৃপান তুলে নিয়ে বার কর বুকের রক্ত, আর সেই রক্তে ভেজা বেলপাতা অঞ্জলি দিয়ে বল—'মা, তোমার কাছে আমি নিজেকে বলি দিলাম।'

গুরুর নির্দেশ পালন করে ছেলেটি। তারপর বুকের রক্তে স্বাক্ষর করে বিপ্লবী দলের প্রতিজ্ঞাপত্রে।

কে এই ছেলেটি, দেশ-মায়ের পায়ের শেকল যার বুকে ব্যথা হয়ে বেজেছিল?

'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' বলে হাসিমুখে ফাঁসীর দড়ি গলায় দিয়ে সেই ছেলেটিই একদিন মায়ের পায়ে বলি দিল নিজের জীবন।

স্বাধীনতার সূর্য আজ ঝলমল করছে আকাশে।

সূর্য-তাপস বীর কিশোর ক্ষুদিরামের আত্মবলিদান ব্যর্থ হয়নি। ব্যর্থ হয়নি তার দীক্ষাগুরু সত্যেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ রাত্রির তপস্যা।

ন্যাড়া

হুগলী জেলার এক গ্রামের পাঠশালা বসে চণ্ডীমণ্ডপে। গুরুমশাই খুব রাগী। তাঁর হাতে থাকে সরু লিকলিকে একখানা বেত। পড়ায় কেউ ফাঁকি দিলে কি বেয়াদপী করলে আর রক্ষে নেই—সপাসপ বেত পড়বে তার পিঠে।

একটি ছেলে ভর্তি হলো পাঠশালায়। ছেলেটি রোগা প্যাকাটে, কিন্তু অসম্ভব বুদ্ধি। আর চোখেমুখে দুষ্টুমি মাখানো।

সত্যিই ছেলেটি ভারি দুষ্টু।

তার ডাক নাম ন্যাড়া। খুব ছোট বেলায় মাথাময় ফোড়া হয়ে অনেক চুল উঠে যায়। আদর করে ঠাক্‌মা 'ন্যাড়া' বলে ডাকতেন। সেই থেকেই তার নাম ন্যাড়া।

ন্যাড়ার উৎপাতে গাঁয়ের লোক অতিষ্ঠ। পাঠশালার গুরুমশাই নাজেহাল।

একদিন ন্যাড়া করেছে কি, গুরুমশায়ের কলকের সব তামাক ফেলে দিয়ে ছোটা ছোট ইটের টুকরো ভরে রেখেছে।

গুরুমশাই টিকে ধরিয়ে কলকে হুঁকোয় বসিয়ে যতই টানেন, ধোঁয়া আর বেরোয় না, কলকের আগুন নিভেই যায়। কলকে উপুড় করতেই আসল রহস্যটা বোঝা যায়।

এ নিশ্চয়ই ন্যাড়ার কাজ।

বেত উঁচিয়ে ন্যাড়াকে তাড়া করেন গুরুমশাই।

ন্যাড়া বেপরোয়া। একে-ওকে ধাক্কা মেরে দুদ্দাড় করে ছুটল সে।

তারপর নাগালের বাইরে।

ন্যাড়ার কীর্তির আর শেষ নেই। তাকে নিয়ে ঘরে-বাইরে নিত্যি অশান্তি।

মা চোখের জল মোছেন আর ঠাকুরকে ডাকেন, 'হে ঠাকুর, সুমতি দাও আমার ছেলেকে।'

কিন্তু ঠাকুমার ধারণা, তাঁর আদরের নাতিটি একদিন বড় মানুষ হবে, দেশজোড়া খ্যাতি হবে তার।

ন্যাড়া কিন্তু লেখাপড়ায় খুব ভালো।

দশবছর বয়সে সে ভাগলপুরে যায়। সেখানে তার মামার বাড়ি।

ভাগলপুরের ইস্কুলে ন্যাড়া ভর্তি হয়। বছরের শেষ পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়ে এত নম্বর পায় যে, তাকে ডবল প্রমোশন দেয়া হয়।

মামার বাড়ির বারান্দায় দাদামশাই খাটের ওপর শুয়ে শুয়ে নাতিনাতনিদের দিকে নজর রাখতেন। ন্যাড়া আর তার মামাতো ভাইবোনেরা সন্ধে হলেই ফরাস পেতে বই-টই নিয়ে বসে পড়ত।

ন্যাড়া ছিল দলের সর্দার। কি বাড়িতে, কি খেলার মাঠে, সর্বত্র সে দলবল নিয়ে একটা-না-একটা কাণ্ড বাধিয়ে বড়দের ভাবিয়ে তুলত।

যাকে বলে গেছো ছেলে, ন্যাড়া ছিল তাই। এই গাছে উঠছে, ওই গাছের ডাল ধরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ; না-হয় গাছে উঠে আরামসে ঘুমোচ্ছে।

ঘুড়ি ওড়ানো, ডাংগুলি খেলা, মাছ ধরা, ফড়িং ধরে সুতো বেঁধে মজা করা— সবটাতেই সে ওস্তাদ।

ন্যাড়া দুর্দান্ত ছেলে। দুষ্টুমির রাজা সে। কিন্তু খুব ছোটবেলা থেকেই তার দরদী মনের পরিচয় পেয়ে অবাক হতে হতো সকলকে।

গ্রামে হয়তো কারুর অসুখে, দূরে শহর থেকে ওষুধ আনতে হবে, অমনি হাতে লণ্ঠন নিয়ে রাত-বিরেতে ছুটলো ন্যাড়া।

এত দুষ্টু ছেলে। এত জ্বালায়। তবু ভালো গুণ বলতে যা বোঝায়, তা ঐ দুষ্টু ছেলের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যায়।

ন্যাড়াকে তাই ছোট-বড় সবাই ভালও বাসত খুব।

ভাগলপুরে থেকে ন্যাড়া আবার নিজের গাঁয়ে ফিরে আসে। তখন তার বয়স তেরো।

ন্যাড়া হুগলীর ইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। কিন্তু এই সময় তাদের বাড়ির অবস্থা এত খারাপ হয়ে যায় যে, বাধ্য হয়ে তাকে কিছুদিন লেখাপড়া প্রায় ছেড়ে দিতে হয়। তখন প্রায়ই সে ঘর ছেড়ে উধাও হয়ে যেত।

ন্যাড়াদের অভাব-অনটন তারপর এত বেড়ে গেল যে, ন্যাড়াকে আবার ভাগলপুরে যেতে হলো।

সেখানেও খুব কষ্ট করে তাকে পড়াশুনা চালাতে হতো।

সামনে প্রবেশিকা পরীক্ষা।

ন্যাড়া থাকে মামার বাড়ির বাইরে একটা ছোট ঘরে। সেখানে শোবার জন্যে একটা দড়ির খাট। পড়ার বই জোটেনা। প্রদীপ জ্বালিয়ে যে পড়বে, তেল জোটেনা।

সারারাত ঘরে ইঁদুরের খুটখাট।

ন্যাড়া একটা বেঁজি পুষেছিল।

রাতে বেঁজিটা ছাড়া থাকত। একদিন অনেক রাত অবধি পড়াশুনা করে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে ন্যাড়া। ভোরে উঠে দেখে' ঘরের মধ্যে মরে পড়ে আছে একটা গোখরো সাপ।

বেঁজি সাপটাকে মেরে ন্যাড়ার জীবন বাঁচিয়েছে।

সেদিনের সেই দুষ্টু ছেলে ন্যাড়া পরে হয়েছিলেন দেশের ও দশের একজন সেরা মানুষ।

ইনিই দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

দুখুমিয়া

নাম তার দুখুমিয়া।

খুব দুঃখের সংসারে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তার জন্ম হয়, তাই তার নাম রাখা হয় দুখুমিয়া।

কিন্তু খুব সুন্দর ফুটফুটে ছেলে। সবার নজর কাড়ত। মা তাই আদর করে 'নজর আলী' বলে ডাকতেন।

তারা বড় গরিব। ইসকুলে ভর্তি হলো বটে, কিন্তু অভাবের জন্যে তাকে ইসকুল ছেড়ে রোজগারের চেষ্টায় বেরোতে হলো সেই বয়সেই।

আসানসোলে একটা রুটির দোকানে সে কাজ পেল। বয়ের কাজ। খাওয়া থাকা আর পাঁচ টাকা মাইনে।

নিজে গরিব। কিন্তু গরিব-দুঃখী দেখলে তার চোখে জল আসে।

এক ভিখিরি রোজ দোকানে আসত, ভাঙা বাটি হাতে দুখুর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত, দুখু তার নিজের ভাগ থেকে দু-এক টুকরো রুটি বা দু-এক মুঠো ভাত তার বাটিতে তুলে দিত।

সেই ভিখারি একদিন মারা গেল। রাস্তায় পড়েছিল তার কংকালসার দেহটা। দুখু লোকজন জুটিয়ে চাঁদা তুলে তার একটা গতি করল।

ভিখিরির শোকে সারাদিন মুখে কিছু দিল না দুখু। কতো কাঁদল। তারপর ঐ ভিখিরিকে নিয়ে চোখের জলে একটা কবিতা লিখল দুখু।

হ্যাঁ, দুখু কবিতা লিখত।

আর গান-বাজনার নামে সে পাগল। কোথাও গান শুনলে ছুটত।

তখনকার দিনে গাঁয়ে-গঞ্জে 'লেটো'র গান ও কবিগানের খুব চল ছিল। দুখু 'লেটো'র দলে ভিড়ে গেল।

তখন তার বয়স মাত্র দশ-এগারো।

লেটো'র দলে সে নিজে অনেক গান বাঁধল। দলে সে হলো ছোট্ট ওস্তাদ।

এতটুকু ছেলে, লেখা-পড়া ছেড়ে লেটোর দলে ঘুরছে। তাকে যারা ভাল-বাসে, তারা দুঃখ পায়। দুখু নিজেও চায় পড়াশুনা

করে বড় হতে। এর আগে সে মক্তবে পড়েছে, প্রাথমিক পরীক্ষা দিয়ে পাশও করেছে। নিজের চেষ্টায় কোরাণ পড়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ—সে সবও কতো পড়েছে। আরও অনেক পড়তে চায় সে!

দুখু লেখাপড়ার সুযোগ পেল। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়ের সাহায্য নিয়ে সে ভর্তি হলো রাণীগঞ্জের শিয়ারসোল হাইস্কুলে। কিন্তু সে ইস্কুল তাকে ছাড়তে হলো।

তারপর ভর্তি হলো মাথরুন স্কুলে।

তখন ঐ মাথরুন স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক। তিনি দুখুকে খুব ভালবাসতেন।

স্কুলে ভালো ছেলে বলে খুব সুনাম হয় দুখুর। সব বিষয়েই তার আগ্রহ। কতোদিকে তার জ্ঞান! কত কী জানে সে।

কিন্তু একবছর পরেই তাকে ইস্কুল ছাড়তে হয়। বাড়ির নিত্য অভাব-অনটন সে সইতে পারে না।

ঐ সময়েই দুখু রুটির দোকানে 'বয়ের কাজ নেয়। তখন তার বয়স আর কত?

এইসময় দুখু আসানসোলের দারোগাসাহেবের নজরে পড়ে। ছেলেটিকে তাঁর ভালো লাগে। আহা, কী সুন্দর চেহারা! আর কী মিষ্টি গানের গলা।

দুখুকে নিজের দেশের বাড়িতে নিয়ে গেলেন দারোগাসাহেব। সেখানকার হাইস্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলেন।

কিন্তু বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে দুখু দেশে ফিরে এল। আবার বন্ধ হলো লেখাপড়া।

তারপর কিছুদিন লেটোর দলে ঘুরে নতুন করে আবার ভর্তি হলো সেই আসানসোলের শিয়ারসোল হাইস্কুলে। অষ্টম শ্রেণীতে।

দুখু খুব মন দিয়ে পড়াশুনা শুরু করল। পর পর প্রতিটি পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে লাগল। ডবল প্রমোশন পেল।

দুখু শুধু ক্লাশের পড়া নয়, বাইরের বইও প্রচুর পড়ত।

আর খুব বেশি করে পড়ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা। রবীন্দ্রনাথ তার প্রিয় কবি!

একদিন খেলার মাঠে এক বন্ধু রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করায় দুখু ক্ষেপে আগুন। বার-পোস্ট তুলে দুখু তাকে এই মারে তো এই মারে।

ভোর আকাশের আলো

দুখু যখন দশম শ্রেণীতে উঠে প্রি-টেস্ট পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছে, সেই সময় হঠাৎ বিশ্ব জুড়ে যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠে। লেখাপড়া ছেড়ে দুখু পল্টনে যোগ দেয়। ছাত্র দুখুমিয়া হয় সৈনিক।

পরে সেই দুখুমিয়া হয় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

সুবি

সুবির মতো ছেলে আর হয় না, বড় ভালো ছেলে সুবি। তার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। কি ঘরে, কি বাইরে।

সুবি ইংরিজি ইসকুলে পড়ে। ফাস্ট হয়।

ফুটফুটে চেহারা। স্বভাবটিও সুন্দর।

ইংরিজি ইসকুল ছেড়ে সুবি ভর্তি হবে ভারতীয় ইসকুলে।

সেখানকার হেডমাস্টার বেণীবাবু। তিনি সুবিকে দেখে কিন্তু-কিন্তু করতে লাগলেন।

এতটুকু ছেলে, এ কি পারবে ক্লাশ সেভেনে পড়তে?

সবিকে যিনি ভর্তি করতে এসেছিলেন, সে-কথা তাঁকে স্পষ্ট জানিয়েও দিলেন বেণীবাবু।

সুবি কিন্তু নিজের বিশ্বাসে অটল হয়ে বলল, 'আমাকে পরীক্ষা করেই দখুন।'

তাই হলো, সুবি পরীক্ষা দিল।

ইংরিজি আর অংক পরীক্ষা দিল সুবি।

তার খাতা দেখে বেণীবাবু খুব খুশি। পিঠ চাপড়ে দিয়ে তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'ভেরী গুড!'

সুবি র‍্যাভেনশ ইসকুলে ভর্তি হলো—ক্লাশ সেভেনেই!

খুব মন দিয়ে লেখাপড়া করে সুবি। ইসকুলে সকলেরই নজর তার দিকে। ক্লাশের বন্ধুরাও তার ভক্ত হয়ে যায়। সে যেন সবার থেকে অন্যরকম।

সুবি আগে আসত সাহেবী পোষাকে, এখন আসে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে।

সুবি লেখাপড়ায় নিশ্চয়ই ভালো, কিন্তু ইংরিজি ইসকুল থেকে আসা ছেলে ইংরিজিতে যতই পাকা হোক, বাংলা ও সংস্কৃত পরীক্ষায় নির্ঘাত ফেল করবে। ক্লাশের অনেক ছেলে তাই নিয়ে আড়ালে বলাবলি করে।

পরীক্ষায় ফাস্ট হয় সুবি।

অবাক কাণ্ড! সুবি বাংলা ও সংস্কৃতও সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে। সংস্কৃতে আবার একশোয় একশো।

হেডমাস্টার বেণীবাবু সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাইকে ডেকে প্রশ্ন করেন, 'কী ব্যাপার, সুবিকে আপনি একশোয় একশো দিয়েছেন ?'

পণ্ডিতমশাই বলেন, 'কি করবো বলুন, একশোর বেশি নম্বর তো আর দেওয়া যায়না।'

সুবির এক মামা বাড়ির বৈঠকখানায় বসে আছেন। বিকেলবেলা। সুবি তখনও ইসকুল থেকে ফেরেনি।

মামা হঠাৎ লক্ষ্য করলেন—পিঁপড়ের লাইন বইয়ের আলমারীর গা বেয়ে উঠছে। লাইনটা ঢুকেছে আলমারীর ভেতর পর্যন্ত।

মামার কৌতূহল হয়।

ব্যাপার কী ? আলমারীর ভেতর পিঁপড়ে কেন ? কী আছে ওখানে ?

একটু পরে সুবি ইসকুল থেকে ফেরে। বইখাতা রেখে সোজা ঢোকে বৈঠকখানায়। তারপর আলমারী খুলে বইয়ের পেছনে থেকে বার করে ক'খানা রুটি।

রুটিগুলো হাতে নিয়ে সুবি হনহন্ করে বেরিয়ে বাড়ির গেট পর্যন্ত যায়।

গেটের বাইরে অপেক্ষা করছিল একজন।

সুবি তার ঝোলায় রুটি ভরে দেয়।

ভিখিরি 'রাজা হও' বলে খুশিমনে বিদায় নেয়।

মামা সবই দেখেন। অবাক হন।

সুবিকে প্রশ্ন করেন, 'তুমিই তাহলে আলমারীতে রুটি রেখেছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথা থেকে পেলে ?'

'আমার সকাল বেলার জলখাবার।'

'তুমি খেলে না ?'

'আমি তিনবেলা খাই, কিন্তু ওর তো সবদিন একবেলাও জোটে না।'

সুবির কথা শুনে মামা তো অবাক।

ইসকুলে সুবি ছাত্রদলের পাণ্ডা। সবাই তাকে মানে। নেতা হওয়ার সব গুণ আছে তার মধ্যে।

সুবি বলে, 'আমরা শহিদ ক্ষুদিরামে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করবো।'

হাত তুলে ছেলেরা সম্মতি জানায়। ক্ষুদিরামের ফাঁসির তারিখে তারা উপোস করে থাকবে। সভা করবে।

র‍্যাভেনশ ইসকুলের ছাত্ররা কিশোর শহীদ ক্ষুদিরামের নামে স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ করে। সারাটা দিন উপবাসে কাটায়। বিকেলে সব ছেলে জড়ো হয় মাঠে।

সুবি বক্তৃতা দেয়।

পরের দিন ইংরেজ পুলিশইনস্পেকটর আসে স্কুলে। হেডমাস্টার বেণীবাবুর কাছে কড়া ভাষায় কৈফিয়ৎ তলব করে ইন্সপেকটর।

বেণীবাবু ভয় পান না।

তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, 'আমার কাজ ওদের পড়ানো, অন্যায় কিছু না-করলে আমি বাধা দিই না।'

মুখের মতো জবাব পেয়ে ইন্‌সপেকটর সাহেব মুখ হাঁড়ি করে চলে যায়।

কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই বেণীবাবুর বদলির আদেশ হয়।

কী অপরাধ তাঁর ?

সুবি ফুঁসে ওঠে, 'এ তো অন্যায়, এ আমরা সহ্য করব না, কিছুতেই না।'

বেণীবাবু সুবিকে বোঝান, 'আমার বদলির চাকরি, কিছু করার নেই। তবে এই যে তুমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে চাইছ, এটাই আশার কথা। সুবি, তুমি মানুষের মতো মানুষ হও। বড় হও। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি।'

চোখের জল সুবি প্রিয় মাস্টারমশাইয়ের পায়ের ধুলো মাথায় নেয়।

সুবি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে।

পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসে।

কিন্তু কখন পড়ে সুবি ? বই-টই ফেলে যখন তখন বেরিয়ে যায়।

কোথায় যায় সে ? কেন যায় ?

কটকে তখন ভয়ংকর মহামারী।

আর্তের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সুবি। বন্ধুদের নিয়ে একটি সেবাদল তৈরি করে। বিপন্ন মানুষের সেবায় ভালছেলে সুবি লেখাপড়ার কথাও ভুলতে বসে।

মা-বাবা চিন্তিত হন।

সুবি এ কী করছে ? ম্যাট্রিক পরীক্ষা যে সামনে, তা কি সুবির খেয়াল নেই ?

বাবা একদিন বাধা দেন।

সুবি পড়তে বসে।

পরীক্ষাও দেয় সুবি।

যথাসময়ে রেজাল্ট বেরোয়। সুবি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সেকেণ্ড।

মা বিশ্বাস করতেই চান না। বলেন, 'আমার সুবি ফার্স্ট হওয়ার মতো ছেলে সে কেন সেকেণ্ড হবে ?'

সে-কথা ঠিকই। পরীক্ষার মুখে সেবার কাজে তার লেখাপড়ার ক্ষতি হয়েছিল খুবই।

ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সেদিনের সুবি ফার্স্ট হতে পারেনি, কিন্তু দেশপ্রেমের অগ্নি-পরীক্ষায় তার দান চিরকালের জন্যে সবার আগে।

ধন্য সুবি।

ধন্য আমাদের ভারত-মায়ের শ্রেষ্ঠ রত্ন দেশগৌরব সুভাষচন্দ্র বসু।

হ্যাঁ, সেদিনের সেই সুবিই আমাদের প্রিয় নেতাজী।

সত্যিকারের ভালো ছেলে

ছেলেটি জমিদার বাড়ির। তার বাবা খুলনা জেলার রাড়ুলি গ্রামের জমিদার। তাদের অনেক জমিজমা, তালুক-মুলুক, গোলাভরা ধান, পুকুরভরা মাছ, ক্ষেতভরা ফসল—বড়লোক জমিদারদের যা যা থাকে সবই উপচে পড়ছে।

জমিদারের ছেলে। কিন্তু তাই বলে সে আলালের ঘরে দুলাল হয়ে মানুষ হতে চায়নি। তার স্বভাব ছিল একেবারে অন্যরকম। নিজের হাতে সব কাজ ক'রে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল। সে—চেয়েছিল মানুষের মতো মানুষ হতে। তার চালচলন সাজপোষাক দেখে কে বলবে যে সে জমিদারবাড়ির ছেলে!

নিজের হাতে মাটি কুপিয়ে সে চাষ করে, ক্ষেতে ফলমূল ফলায়, সে-সব মাথায় নিয়ে আবার হাটে যায় বেচতে। বলে, 'সে বসে বসে খাবে না—খেটে খাবো, তাতে লজ্জা কীসের?'

পড়া-পড়শিরা আড়ালে ছি-ছি করে। জমিদারের ছেলে ধুলোকাদা মেখে চাষ করে হাটে যায় বেচতে? কী ঘেন্নার কথা! এ যে ঘোর কলি। সবই উল্টো এখন।

ছেলেটি হাসে। লোকনিন্দা তাকে টলাতে পারে না।

ছোটবেলা থেকেই ছেলেটি ঐ রকম। কতো কাজ সে করে। লেখাপড়াতেও সে খুব ভালো ছেলে।

তার হাতেখড়ি হয় চার বছর বয়সে। গ্রামে ছিল গুরুমশায়ের পাঠশালা। সেখানেই তার লেখাপড়ার শুরু। পড়তে বসার জন্যে একটিবারও বলতে হয় না তাকে; লক্ষ্মীছেলের মতো নিজেই পড়তে বসে।

তারপর ছেলেটিকে কলকাতায় পাঠানো হয় লেখাপড়ার জন্যে। তাকে ভর্তি করা হয় হেয়ার স্কুলে। সেই স্কুলে তিন বছর সে পড়ে। সেখান থেকে যায় কেশবচন্দ্র

সেনের অ্যালবার্ট স্কুলে। এই স্কুল থেকেই সে ১৮৭৯ সালে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে। তারপর ভর্তি হয় মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশন কলেজে।

ছেলেটি এফ, এ, পরীক্ষার জন্যে তৈরি হয়। খুব মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করে। রাত থাকতে উঠে পড়তে বসে। তখন তার খালি পড়া আর পড়া। লেখাপড়াই যেন তার ধ্যান-জ্ঞান।

খুব ছোটবেলা থেকেই ছেলেটি নানারকম বই পড়তে ভালবাসত। শুধু পাঠ্যবই

পড়েই সে খুশি থাকত না। যখন তার বয়স মাত্র বারো, তখন থেকেই রাত-ভোরে উঠে বই নিয়ে বসত। বই পড়া তার নেশা।

ছেলেটি মেট্রোপলিটান কলেজে পড়ে। কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রায়ই যায় পেড্‌লার সাহেবের ক্লাস নিতে। পেড্‌লার সাহেবের তখন অধ্যাপক হিসাবে খুব নামডাক। ছাত্রদের রসায়ন শাস্ত্র পড়াতেন তিনি। ছেলেটি রসায়ন ভাল করে বোঝার জন্য তাঁর বক্তৃতা শুনতে যায়।

ছেলেটি সব বিষয়েই মনোযোগী। সব বই সে মন দিয়ে পড়ে। কিন্তু রসায়নের প্রতি তার যেন বেশি টান। ঐ বিষয়ে চর্চায় সে আনন্দ পায়। আরও বেশি বেশি জানতে চায়। কলেজে রসায়নের যে-বই পড়ানো হয় তা তো পড়েই, উপরন্তু লাইব্রেরী থেকে আরও কতো রসায়ন শাস্ত্রের বই জোগাড় করে সে পড়ে। সব দামী দামী মোটা মোটা বই। শুধু তাই নয়, নিজের বাড়িতেই সে একটা ল্যাবরেটারী তৈরি করে ফেলে। সেই ল্যাবরেটারীতে রসায়ন নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে, দস্তুরমত একজন গবেষকের মতোই। একবার তো একটা মারাত্মক দুর্ঘটনাই ঘটে গেল ঐ ল্যাবরেটারীতে। অল্পের জন্য রক্ষা পেল সে।

এফ, এ, পাশ করে বি, এ, ক্লাশে ভর্তি হয় ছেলেটি। এই সময়ে সে সংকল্প করে, গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষা দেবে, বৃত্তি পেলে সেই টাকায় বিলেত যাবে, সেখানে বিজ্ঞানচর্চা করবে আরও ভালভাবে।

কিন্তু গিলক্রাইস্ট বৃত্তী পরীক্ষা পাশ করা এত সোজা নাকি ? কম করেও চারটি ভাষা শেখা চাই ঐ পরীক্ষা দিতে। বন্ধুরা তো কেউ কেউ ঠাট্টা জুড়ে দেয় তার দুঃসাহস দেখে।

ছেলেটি তবু দমে না। সকলের চোখের আড়ালে চুপি চুপি নিজেকে তৈরি করে। যতো কঠিনই হোক, ঐ পরীক্ষা সে দেবেই।

অতিরিক্ত পরিশ্রমে অসুস্থ হয়ে পড়ে ছেলেটি। রোগভোগ করে একসময় সুস্থ হয় বটে, কিন্তু শরীর খুব দুর্বল হয়ে যায়। কিন্তু অসম্ভব মনের জোর ছেলেটির। প্রতিজ্ঞায় সে অটল। রুগ্ন শরীর নিয়েই সে একে একে চারটি বিদেশী ভাষাশিখে ফেলে। তারপর গিলক্রাইস্ট পরীক্ষাও দেয়।

পরীক্ষার ফল বেরোয়। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সত্যিই অসাধ্য সাধন করে ছেলেটি। সে গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পায়। সারা ভারতের মধ্যে মাত্র দুটি ছেলে সে-বছর ঐ বৃত্তি পায়। ছেলেটি দু'জনের মধ্যে একজন। তার এই সাফল্যে দেশে সাড়া পড়ে যায়। সেটা ১৮৮২ সালের কথা। তখনকার হিন্দু পেট্রিয়ট কাগজ ছেলেটির খুব প্রশংসা করে লেখে—নতুন কীর্তি স্থাপন করেছে সে। তার জন্যে সারা দেশ গর্বিত।

বৃত্তি পেয়ে একুশ বছর বয়সে বিলেতে যায় ছেলেটি। সেখানে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। সেখানেও সে রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে পড়ে। ১৮৮৫ সালে বি, এস, সি, পাশ করে গবেষণার কাজ করে। তার গবেষণার বিষয় অজৈব রসায়ন। ১৮৮৭ সালে গে, ডি, এস, সি, ডিগ্রী ও 'হোপ পুরস্কার' লাভ করে। তারপর বিলেতে আর এক বছর গবেষনা করে বিজ্ঞানে ডক্টরেট ডিগ্রী পায়।

এবার দেশে ফেরার পালা।

১৮৮৮ সাল। ছেলেটি দেশে ফিরছে। পকেটে পরসা নেই। জাহাজের এক কর্মচারীর কাছ থেকে আটটি টাকা ধার করে। তাকে বাঁধা রাখতে হয় তার জিনিসপত্র।

ছেলেটি সাহেবদের দেশ থেকে ফিরছে। কিন্তু আশ্চর্য, সাহেবী পোষাকের বদলে বাঙালীর নিজস্ব পোষাক ধুতি-চাদর পরেই সে আবার ফিরে এল তার গ্রামের বাড়িতে—বাঙলা মায়ের কোলে।

সেদিনের সেই ছেলেটিই হলেন বাঙালী জাতির গর্ব আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তিনি ছিলেন এক মহাবিজ্ঞানী, কর্মযোগী ও মনে-প্রাণে এক খাঁটি স্বদেশী। আচার্য মানে শিক্ষাগুরু। তিনি শুধু তাঁর ছাত্রদেরই শিক্ষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন সারা দেশের সব মানুষের শিক্ষাগুরু।

এসো, আমরা এই সেরা বিজ্ঞানী ও সেরা মানুষের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রণতি জানাই।

চিত্ত

গরমকালের ভরদুপুর। আকাশে আগুন। বাতাসে আগুনের হলকা। গাঁয়ের পথঘাট সুনসান।

দাশবাবুদের বাড়ির ছোট্ট ছেলেটি এমন সময় কোথায়? কী করছে সে?

কোথায় আবার, নিশ্চয়ই ঐ আমবাগানে! হাতে তার পেনসিল-কাটা ছুরি। আর কোঁচড়ে কচি কচি আম।

তাই বলে সে দুষ্টু নাকি?

মোটেই না।

ঘুরে ফিরে মায়ের কাছটিতে একবারটি তার আসা চাই-ই। মা-কে যে বড় ভালবাসে। সে যে মায়ের বড় বাধ্য ছেলে।

ঐ তো সে এখন লাফাতে লাফাতে ছুটছে ঘরের দিকে। মা-কে মনে পড়েছে। কী করছে মা এখন?

ঘরের ভেতরে সুড়ুৎ করে ঢুকে পড়ে ছেলেটি। না, মা-কে জাগাবে না। মা ঘুমোচ্ছেন। মুখের উপর একটা বই।

কিন্তু অসাবধানে মায়ের পা তার গায়ে ঠেকে যায়। মায়ের তন্দ্রা ভাঙে। চোখ না খুলেই তিনি বলেন, 'কে, চিত্ত? বাঃ তোর গাটা তো বেশ ঠাণ্ডা রে!'

মায়ের পা দু'খানি কোলের ওপর তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আরামে ফের তন্দ্রা নামে মায়ের চোখে। চিত্ত ঠায় দাঁড়িয়েই থাকে।

খানিক বাদে মা চোখ মেলেই অবাক। ছেলে তাঁর পা দু'টি হাতে নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে একঠায় দাঁড়িয়ে। নড়েনি এতটুকু, পাছে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়।

হ্যাঁ, এই হলো মা নিস্তারিণী দেবীর কোল আলো করা ছেলে চিত্ত। বড় ভালো ছেলে। তখন কতই বা বয়স তার? বড় জোর সাত কি আট।

দুষ্টুমি বলতে চিত্তর ঐ একটাই—দুপুরে আমবাগানে ঘুরঘুর করা। এই ধরো, সবাই খেতে বসেছে, চিত্তর দেখা নেই। কোথায় গেল ছেলেটা? খোঁজ খোঁজ। ও মা, ঐ তো ছেলে আম বাগানে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে!

চিত্তর লেখাপড়ায় খুব মন। পড়তে যখন বসে, এমন একমনে পড়ে, তখন আর কোনও দিকেই তার খেয়াল থাকে না। মনে হয় যেন ধ্যানে বসেছে।

একদিন চিত্ত লেখাপড়া করছে। মা সামনে রেখে গেলেন দুধের বাটী। চিত্তর হুঁস নেই।

কিছু পরে মা এসে জিগ্যেস করেন, 'কি রে, দুধ খেয়েছিস?'
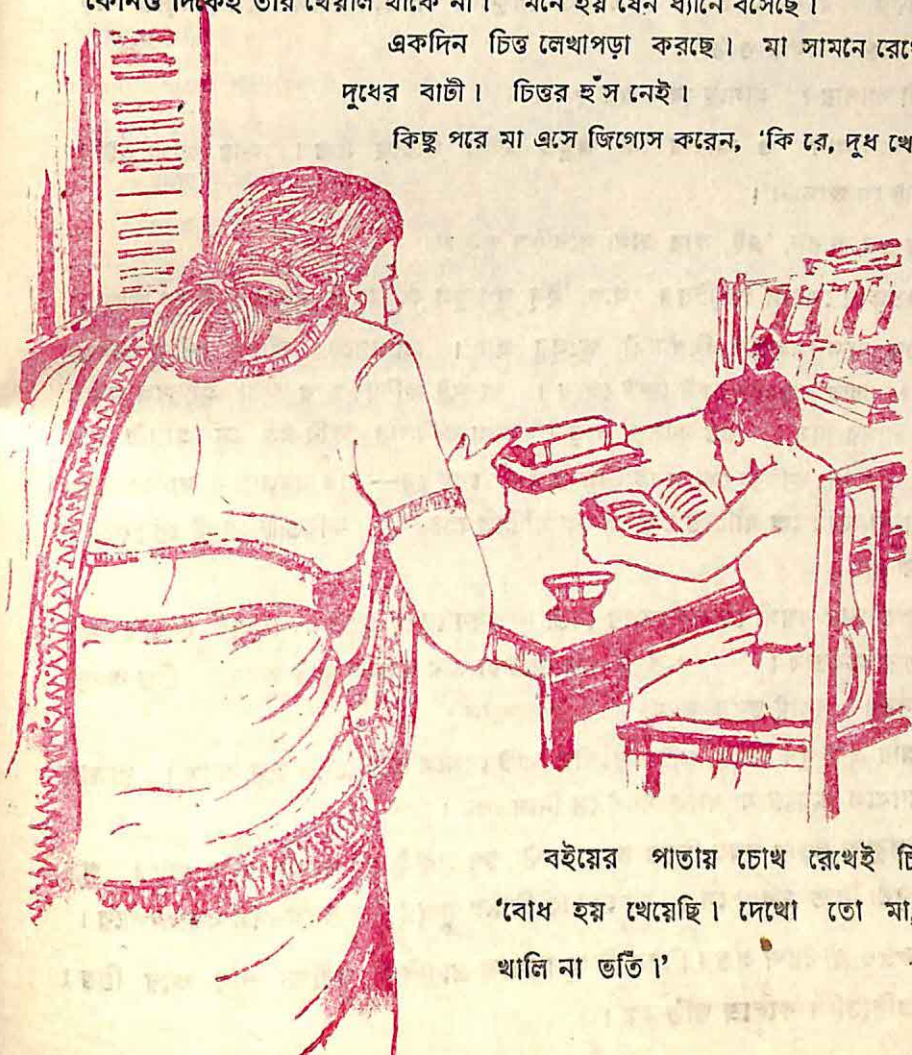
বইয়ের পাতায় চোখ রেখেই চিত্ত বলে, 'বোধ হয় খেয়েছি। দেখো তো মা, বাটীটা খালি না ভর্তি।'

ছেলের কথায় মা হাসবেন না কাঁদবেন ভেবে পান না। দুধভরা বাটীর দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, 'দেখেছ ছেলের কাণ্ড। দুধ যে জুড়িয়ে জল!'

এমন বেহুঁস ছেলে আর দুটি নেই। এই তো সেদিন কী কাণ্ডটাই না করল সে।

ইসকুলের টাইম। জামা-টামা পরে রেডি হয়ে চিত্ত খেতে বসেছে। তার সঙ্গে বসেছে বাড়ির আর সব ছোটরা। তাদেরও ইসকুল। চিত্তকে দেখে হেসে গড়িয়ে পড়ে সকলে। খাওয়া মাথায় ওঠে।

কী ব্যাপার? হাসছে কেন ওরা?

হাসবে না? ও আবার কি অদ্ভুত জামা পরেছে চিত্ত! কার জামা ওটা? খুবই ছোট যে জামাটা।

মা প্রশ্ন করেন, 'এই, কার জামা পরেছিস তুই?'

এতক্ষনে খেয়াল হয় চিত্তর বলে, 'ইস্‌, খুব ভুল হয়ে,গেছে এটা তো ইন্দুর জামা।'

চিত্ত তখন লণ্ডন মিশনারী স্কুলের ছাত্র। লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে কবিতা লেখে সে। তার বন্ধুরাও কেউ কেউ লেখে। পকেটে কবিতা ভরে তারা ইসকুলে যায়। কবিতার আসর বসে। চিত্ত কবিতা পড়ে। অন্য কবিদের কবিতাও সে আবৃত্তি করে শোনায়। একটা কবিতা তো খুবই প্রিয় তার। সেই যে—কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে কে বাঁচিতে চায়···।' কবিতাটি প্রায়ই চেঁচিয়ে সে আবৃত্তি করে।

চিত্ত তার বয়সী ছেলের দলের নেতা। যেন নেতা হওয়ার জন্যেই জন্মেছে সে, এমনই তার হাবভাব। [illegible]-ঝাঁটি হলে ছেলেরা তার কাছেই ছুটে আসে। চিত্ত ঝগড়া মিটিয়ে দেয়। সবাই তাকে মানে, [illegible] মানে।

আর এক গুণ চিত্তর, গরীব-দুঃখীর কষ্ট দেখলে তার চোখে জল আসে। রাস্তায় ভিখিরি দেখলে পকেটে যা থাকে সবই সে দিয়ে দেয়।

ইসকুলে পড়ার সময় চিত্তর আর একটা গুণ সবাইকে অবাক করে দেয়। খুব ভালো বক্তৃতা দিতে ওস্তাদ সে। যে কোনও বিষয়ে সুন্দর ভাষায় অনর্গল বলতে পারে।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন মিশনারী স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে চিত্ত। তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হয়।

চিত্ত তখন বড় হয়েছে। কলেজে পড়ে। একদিন তার সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে হৈ হৈ করে যাচ্ছে বড় রাস্তা দিয়ে। রাস্তার ধারে এক জ্যোতিষী বসেছে খড়ি পেতে, খদ্দেরের আশায়। কলেজের ছেলেরা যাচ্ছে দেখে সে ডাকাডাকি শুরু করে, 'এই যে বাবারা, এসো, হাত দেখিয়ে যাও।'

চিত্ত ও তার বন্ধুরা বসে পড়ে জ্যোতিষীর সামনে। মজা করতেই চিত্ত হাত বাড়িয়ে দেয়।

চিত্তর হাত দেখে জ্যোতিষী বলে, 'তুমি তো রাজা হবে দেখছি। রাজার মতো তোমার ধনদৌলত হবে, যশও হবে দেশজোড়া।'

চিত্ত হাসে।

জ্যোতিষী এবার পয়সার জন্যে হাত বাড়ায়।

চিত্ত বলে, 'না ঠাকুর, এখন নয়, তোমার ভবিষ্যৎবাণী যখন ঠিক ঠিক মিলে যাবে, তখনই তুমি দক্ষিণা পাবে।'

তা চিত্ত তার কথা রেখেছিল। সেই গণক ঠাকুরের কথাই সত্যি হলো একদিন। চিত্ত হলো খুব বড় ব্যারিস্টার। তখন দেশ জুড়ে তার নাম-ডাক। দু'হাতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করে সে।

চিত্ত সেই জ্যোতিষীকে ভুলে যায় নি। একদিন নিজে সেই ফুটপাতে গিয়ে তার একদিনের রোজগার গণঠাকুরের হাতে তুলে দেয়।

সেই রোজগারের টাকার পরিমাণ কতো জানো?

এক হাজার!

হ্যাঁ, সেদিনের সেই চিত্তই হলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। তিনি তাঁর দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসে অমর হয়েছেন। দেশকে স্বাধীন করতে, দেশের মানুষের দুঃখ দূর করতে তিনি তাঁর সবকিছু ছেড়ে পথে নেমে এসেছিলেন। তাঁর মৃত্যু নেই।

তাঁর প্রয়াণে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ।
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥

বাঘা যতীন

বাঘ ! ইয়া বড় একটা কেঁদো বাঘ !

কোথায় ?

ঐ তো কলুপাড়ায় ।

সত্যি ?

হ্যাঁ গো, অমুক দেখেছে, তমুক দেখেছে—ডোরাকাটাটা নাকি ঘুরঘুর করছে বেতবনের আড়ালে আবডালে ।

গাঁ-সুদ্ধ লোক তো বাঘের ভয়ে কাঁটা । কখন যে কার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে হালুম করে । বাপ রে বাপ !

কলুপাড়ার লোকেরা তখন ছুটল যতীনের বাড়ির দিকে । হ্যাঁ, একমাত্র যতীনই পারে বাঘের উৎপাত থেকে তাদের বাঁচাতে । যাকে বলে ডাকাবুকো ছেলে, যতীন হলো তাই । অসম্ভব সাহস তার ।

অনেক রাতে ঘরে ফিরে যতীন তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে ।

'আহা, ঘুমোক । ওকে ডেকে কাজ নেই ।' এই বলে যতীনের দুই ভাই ঘাড়ে বেরিয়ে পড়ল বাঘ মারতে । হৈ হৈ করে গাঁয়ের ছেলে-ছোকরার দল চলল তাদের পেছনে ।

বেতঝোপের আড়ালে বাঘটা ঘুমোচ্ছিল । অত লোকজন আর শব্দ-সাড়ায় গেল ঘাবড়ে, দিলে প্রচণ্ড এক লাফ, তারপর ভোঁ-দৌড় । অমনি দুম্ করে গুলি চালিয়েছে ফণীন্দ্র । কিন্তু বাঘের গায়ে আঁচড় কেটে ছুটে গেল গুলিটা । তাতে বিপদ বাড়ল বই কমল না । বাঘটা তখন রাগে গজরাতে গজরাতে গাঁয়ের রাস্তা ধরে ছুটতে লাগল ।

রাস্তায় যতো লোক, তারাও পড়ি কি মরি করে যে যেদিকে পারল প্রাণভয়ে দিলে ছুট্ ।

গুলি-খাওয়া খ্যাপা বাঘ—সে যে আরও ভয়ংকর।

এদিকে যতীনের তো ঘুম ভেঙেছে। সব শুনে সে বাসিমুখে বেরিয়ে পড়ল কলুপাড়ার দিকে। তার হাতে একটা ছুরি। না, ছুরিটা বাঘ মারবার জন্যে নয়, একটা নিমডাল কেটে দাঁতন করার জন্যে।

দাঁতন করতে করতে যতীন চলেছে। সে যখন কলুপাড়ার কাছাকাছি, দেখল, তার দুই দাদা বন্দুক বাগিয়ে তেড়ে আসছে। পেছন পেছন হৈ-হল্লা করে আসছে বিস্তর লোক।

তবে কি বাঘটা এদিকেই ছুটে এসেছে তাড়া খেয়ে?

থমকে দাঁড়াল যতীন।

হঠাৎ পাশের ঝোপ থেকে হালুম করে লাফিয়ে পড়ল কেঁদোটা। আর পড়বি তো পড় যতীনেরই ঘাড়ে! এক মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হলো যতীন, কিন্তু তখুনি সামলে নিয়ে এক ঝটকায় গা থেকে ঝেড়ে ফেলল বাঘটাকে। তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠেই বাঘ এবার যতীনের দুই কাঁধে দুই থাবা বসাল।

বাঘের মস্ত হাঁ-মুখটা যতীনের গলার কাছে।

আর বুঝি রক্ষে নেই।

দূর থেকে সেই ভয়ানক দৃশ্য দেখে হায় হায় করে ওঠে সবাই। কী করবে এখন তারা? গুলি করবে বাঘটাকে? কিন্তু সে গুলি তো যতীনের গায়েও লাগতে পারে?

তবে যতীনও কম যায় না। তার গায়ে তখন ভীমের জোর। লোহার শাঁড়াসির মতো তার দুটো হাত চেপে বসল বাঘের গলায়। বাঘবাবাজী তখন তো বেকায়দায়। তার হাঁ-মুখটা আর কিছুতেই যতীনের গলার নাগাল পায় না।

বাঘে-মানুষে সে কী ভয়ংকর লড়াই! এই বাঘ ওপরে তো যতীন নীচে, আবার এই যতীন ওপরে তো বাঘ নীচে।

বাঘের দাঁত আছে বড় বড় নখ আছে ছুঁচলো। কিন্তু যতীনের কী আছে?

পকেটে একটা ছুরি আছে না?

হ্যাঁ, তাই তো!

একহাতে বাঘের গলাটা চেপে ধরে, আর এক হাতে ঝট্ করে পকেট থেকে ছুরিটা বের করে যতীন। তারপর দাঁত দিয়ে বাঁটওলা ছুরিটা খুলেই বাঘের গলায় বসিয়ে দেয়। একবার। দু'বার। তিনবার। বারবার বাঘের গলায় ছুরির ছোবল বসায় যতীন।

শেষ পর্যন্ত মানুষেরই জয় হলো। দফারফা হলো প্রকাণ্ড এক বাঘের। বাঘ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

যতীনের ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহটাকে কাঁধে নিয়ে গাঁয়ের লোক ছুটল তার বাড়ির দিকে।

যতীন বেঁচে আছে। যতীনকে বাঁচাতে হবে।

সেই থেকে যতীন হলো 'বাঘা যতীন'।

এখন বাঘা যতীনের আর একটা গল্প শোন।

যতীন দার্জিলিং যাচ্ছে। জরুরী কাজে।

শিলিগুড়ি স্টেশন। ট্রেন ছাড়বে। এমন সময় যতীনের কানে এল—কে যেন 'জল জল' করে তেষ্টায় ছটফট করছে। কে? যতীনের চোখ পড়ল, কামরায় একজন মহিলার খুব অসুখ। তিনিই জল চাইছেন। আর তাঁর স্বামী গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করছেন 'পানি পাঁড়ে, এই পানি পাঁড়ে। কিন্তু কোথায় পানিপাঁড়ে?

যতীন আর থাকতে পারল না, ভদ্রলোকের হাত থেকে ঘটিটা নিয়েই লাফিয়ে নামল প্ল্যাটফর্মে।

তারপর দৌড়ল স্টেশনের কল থেকে জল আনতে। তাড়াহুড়োর ধাক্কা লাগল মিলিটারী পোষাক পরা এক ইংরেজের সঙ্গে। যতীন লজ্জা পেয়ে বলল, 'আই অ্যাম সরি?

ভারতে তখন ইংরেজ রাজত্ব। এদেশের মানুষকে তারা মানুষ বলেই মনে করে না। যতীন তো আর ইচ্ছে করে ধাক্কা লাগায় নি? তা ছাড়া সে 'সরি' বলে ক্ষমাও চেয়েছিল। কিন্তু লালমুখো সাহেবটার তবু কী রাগ। তার হাতে ছিল একটা ছড়ি। শপাং করে এক ঘা বসিয়ে দিল যতীনের পিঠে।

কি, এতবড় অপমান? যতীনের চোখ দিয়ে আগুন ঝরতে লাগল। কিন্তু তখনকার মতো সামলে নিয়ে সে আবার ছুটল, জল নিয়ে তখুনি ফিরে এল সেই কামরার কাছে, ঘটিটা তুলে দিল ভদ্রলোকের হাতে।

এবার বদলা নিতে হবে।

দুমদাম পা ফেলে যতিন এগিয়ে গেল, বুক ফুলিয়ে মুখোমুখি হলো সেই বেআদব সাহেবের। 'ভগবানকে ডাকো' এই না বলেই সে ধাঁই করে এক রামখুসি বসিয়ে দিল সাহেবটার নাকে।

সাহেব তো সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে চিৎপাত। তার নাকে মুখে রক্ত।

ব্যাপার দেখে সাত-আটজন গোরা সৈন্য ছুটে এল। কিন্তু যতীনের তখন কী তেজ? একা সে জোর লড়াই লড়ে গেল অতজনের সঙ্গে। আর কী ভয়ানক তার ঘুসি এক একখানা। বাঙ্গালী ছেলের ঘুসি খেয়ে সাহেবগুলোর আক্কেল তো গুড়ুম!

ভীড় জমে গেল চারদিকে ছুটে এল স্টেশন মাস্টার, লাঠি-বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে এল পুলিশ-টুলিশ। পাকড়াও করল যতীনকে।

কালা আদমি হয়ে সাহেবের গায়ে হাত তোলা? এত বড় সাহস?

তা সাহস তো বটেই। তবে অন্যায় সাহস নয়, সৎসাহস। অন্যায় তো ঐ সাহেবটার। যতীন তাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে।

যাক, সেবার কোনও গতিকে জেল-পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেল।

বাঘের সঙ্গে লড়াই করে যতীন হয়েছিল বাঘা যতীন। পরে সেই যতীনই আবার বলদর্পি ব্রিটিশ সিংহের সঙ্গে লড়াই করে দেখিয়ে গেছে। লড়াই কাকে বলে।

সে আর এক গল্প।

ব্রিটিশ সিংহের গর্ব খর্ব করে স্বাধীনতা যুদ্ধের গল্প।

ভোরের আকাশে স্বাধীনতার সূর্য উঠেছিল শত সহস্র শহীদের রক্তে রাঙা হয়ে।

বাঘা যতীন সেই অমর শহীদেরই একজন। তাঁর পুরো নাম যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

———

মজার ছেলে

সেদিন দুপুরবেলায় ছোট্ট ছেলেটি তাদের বাড়ীর পুকুরঘাটে বসে আছে। তবে সে একা নয়, সঙ্গে আছে তার দাদা আর দিদি।

জায়গাটা নির্জন।

হঠাৎ ঝোপ-জঙ্গল ঠেলে বেরিয়ে এল একটা লোক। ষণ্ডামার্কা চেহারা। তার হাতে রক্তমাখা ছোরা, সেটা দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে রক্ত ঝরছে।

ওরে বাবা রে! ডাকাত নাকি?

দাদা ও দিদি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। ছোট ভাইটি কিন্তু একটুও ভয় পায় না। বুক ফুলিয়ে সে লোকটার পথ আগলে দাঁড়ায়।

পরে জানা যায়, লোকটা খুনে ডাকাত নয়। সে এসেছিল পুকুরঘাটে হাত ধুতে—ছেলেটিরই বাড়িতে সদ্য সদ্য পাঁঠা কেটে।

সে যাই হোক, মাত্র ছ' বছরের ছোট্ট ছেলেটির কী সাহস বলো তো?

খুব ছটফটে ছেলে সে। আর সব সময় একটা না একটা মজা চাই তার। কোনও কোনও ছেলের ঘাড়ে ভূত চাপে, তার ঘাড়ে চাপে মজা। এমন রগড় করে মাঝে মাঝে যে, তার চেয়ে বড় ভাইবোনেরা সব হেসে কুটোপাটি। আবার দুষ্টুমিতেও কম যায় না, ছোট একটা লাঠি হাতে ছোট ছোট মেয়েদের তাড়া করে, তারা ভয় পেয়ে ছুটে পালায়।

তার বাবার অনেক বই। হয়তো সে তাক থেকে ছবিওলা একটা বই টেনে নামাল। তাতে হরেক রকম জীবজন্তুর ছবি। একটা করে ছবি বার করবে, আর সেই আজব জানোয়ারের গল্প বলতেও সে ওস্তাদ। কত যে বানায়! ভবন্দোলা, মণ্ডপাইন, কোম্পু—এইরকম উদ্ভট নামের অদ্ভুত যতো জন্তুর গল্প সে বলে।

আর ছেলেটির সব বিষয়েই খুঁটিয়ে জানবার কৌতূহল। খুব যখন ছোট ছিল,

খেলনাপাতি ঠুকে ঠুকে ভেঙে দেখত, কী আছে তাতে। বাজনাগুলো ভাঙত—কেমন করে শব্দ বেরোয় তা জানা চাই তার।

এমন মজার ছেলে আর হয় না। কতরকম মুখভঙ্গী করে সে হাসায়। রাগমুখ, হাসিমুখ, কান্নামুখ, ভয়মুখ, ন্যাকামুখ,

বোকামুখ—কত রকম মুখ। যতো ছড়া যা কবিতা পায়, সব মুখস্ত করে ফেলে, চেঁচিয়ে আবৃত্তি করে শোনায়।

সে নিজেও কবিতা লেখে। মাত্র আট বছর বয়সে লেখা তার কবিতা 'নদী' ছাপা হয় মুকুল পত্রিকায়। আর ন' বছর বয়সে লেখে 'টিক টিক টং', সেটিও ছাপা হয়।

ছেলে ছবিও আঁকে। ঐ বয়সেই কী সুন্দর আঁকে। তার বাবা রঙ-তুলি জুগিয়ে খুব উৎসাহ দেন। সে মজার মজার ছবি এঁকে খাতা ভরায়।

একবার তার দিদি সুখলতা, ছোট বোন পুণ্যলতা আর মাসি সুরমা—এই তিনটিতে টবে ফুলগাছ লাগিয়েছে। দিদি আর সুরমা মাসির গাছে কী চমৎকার নীলরঙের ফুল ফুটল। কিন্তু পুণ্যলতার গাছে শাদা কুঁড়ি। দেখে তো খুব মন খারাপ হলো তার।

পরের দিন সকালে উঠে পুণ্যলতা অবাক। ও মা, সব যে রঙিন ফুল! সুন্দর সুন্দর নানারঙের ফুল ফুটে আছে তার গাছে। ছিল শাদা, রাতারাতি হলো রঙিন? অবাক কাণ্ড তো!

খুব আনন্দ হলো ছোট বোনের। কিন্তু খানিক বাদে মাটিতে রঙের ছিটে চোখে পড়ল তার। তখন আর বুঝতে কিছু বাকি থাকল না। এ তবে ঐ গুণধর দাদাটির কাণ্ড! খুব ভোরে উঠে রং-তুলি নিয়ে তার সব ফুল সে রঙিন করে দিয়েছে।

সেবার তারা সবাই মিলে গেছে বেড়াতে। সঙ্গে আছেন পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। উপাসনা হবে, আমোদ-আহ্লাদ হবে, জোর খাওয়া-দাওয়াও হবে। ড্রামভর্তি রসগোল্লা এসেছে। শাস্ত্রীমশাই সে-দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সব রসগোল্লা কে একলা খেতে পারো?'

অমনি ছেলেটি চেঁচিয়ে বলল,, 'আমি পারি।' তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'অনেক দিন ধরে।'

বাড়িতে এক আত্মীয় এসেছেন। তিনি পেট-রোগা মানুষ। মেজাজও তিরিক্ষে। ভয়ে কেউ কাছে ঘেঁষে না। ক'দিন কাটিয়ে তিনি দেশে ফেরার জন্যে সব বাঁধা-ছাঁদা করছেন। একটা মাগুর মাছ সঙ্গে নিয়ে যাবেন। ছোট্ট টীনের কৌটোয় সেটাকে জোর করে ভরবার চেষ্টা করছেন। ছেলেটীর চোখে পড়ল। বলল, 'অতটুকু জায়গায় মাছটা আঁটবে কেন?'

ছোটমুখে বড় কথা শুনে ক্ষেপে গেলেন আত্মীয়টী। খ্যাঁক করে উঠলেন, 'আবার কত বড় টীন চাই শুনি ?'

'তাই বলে এতটা রাস্তা ওটাকে কষ্ট দিতে দিতে নিয়ে যাবেন ?'

ব্যস, তিনি তখন রেগে আগুন তেলে বেগুন। চিৎকার করে বললেন, 'নিজেরা মাছ মেরে খাও না ? যতো দোষ আমার বেলায় ?'

ছেলেটি তবু ছাড়বে না। শান্ত হয়ে সে জবাব দেয়, 'মেরেই তো খাবেন, কিন্তু অতক্ষণ ধরে কষ্ট দেবেন কেন ?'

শেষ পর্যন্ত আত্মীয়টীকে হার মানতে হয়। ছোট টীনের বদলে একটা বড় টীন নিতে বাধ্য হন তিনি।

সেই ছেলেটীর নাম সুকুমার রায়।

হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ, ইনিই তোমাদের সেই প্রিয় কবি সুকুমার রায়। তাঁর লেখা আবোল-তাবোল, খাইখাই, হ-য-ব-র-ল—এসব বই কোন্ ছেলে না পড়েছে ? তাঁর অনেক মজার কবিতা তো তোমাদের মুখস্থ। আর মজার গল্প পড়ে তো তোমরা হেসে গড়াগড়ি যাও।

সুকুমার রায় রসের রাজা, হাসির রাজা, চিরকালের জন্যে ছোট-বড় সকলের মনেরও রাজা।

সুকুমারের ছোটবেলার গল্প তোমরা শুনলে। এ গল্প আমাদের বলেছেন তাঁরই ছোটবোন, শিশুসাহিত্যের আর এক বিখ্যাত লেখিকা পুণ্যলতা চক্রবর্তী।

অনুশীলনী

দস্যি ঠাকুর

১। দস্যি ছেলেটিকে তার মা আদর করে কী নামে ডাকতেন ? ঐ নামকরণের কারণ কী ?

২। ছোট্ট নিমাই সন্দেশ ফেলে মাটি খাচ্ছিলেন, মা অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে তিনি কী উত্তর দিলেন ?

৩। নিমাই কোন্ পণ্ডিতের টোলে ভর্তি হন ?

৪। শ্রীচৈতন্য কোন্ ধর্ম প্রচার করেন ? সেই ধর্মের মূল কথা কী ?

বোপদেব

১। বোপদেব ছোটবেলায় পুকুরঘাটে ঠায় বসেছিলেন কেন ?

২। তিনি পুকুরঘাটে কোন দৃশ্য দেখেন ? সেই দৃশ্য দেখে তাঁর মনে বিদ্যুৎচমকের মতে কোন্ চিন্তার উদয় হয় ?

৩। বোপদেব কী ভাবে ব্যাকরণের কঠিন সূত্রগুলি আয়ত্ত করেন ?

বীরসিংহের সিংহশিশু

১। শৈশবে বিদ্যাসাগর কী ভাবে ইংরাজী এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা চেনেন ?

২। কলকাতার বাসায় বালক ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখাপড়া ছাড়াও আর কী কী কাজ করতে হতো ?

৩। 'এ তো অসাধারণ ছেলে !'—এ কথা কে বলেন ? তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের অসাধারণ ক্ষমতার কী পরিচয় পেলেন ?

৪। বিদ্যাসাগরের কোন্ বই পড়ে আমাদের লেখাপড়া শুরু হয় ?

ক্লাশ থেকে পালিয়ে

১। সাত বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র ক্লাশ ফাঁকি দিয়ে কী দেখতে বেরিয়েছিলেন ?

২। মাস্টারমশাইয়ের সব রাগ জল হয়ে গেল কেন ?

৩। শিশু বঙ্কিম সাত দিনের পড়া মাত্র এক ঘণ্টায় শেষ করে ফেলায় মাস্টারমশাই তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কী বুঝতে পারেন ?

ক্ষুদে কবি

১। ঠাকুরবাড়ির ভৃত্য শ্যাম শিশু রবিকে নজরবন্দী করে রাখতে কী ফন্দী আঁটে ?
২। ক্ষুদে মাস্টার রবির বেত হাতে ছাত্র পড়ানোর বর্ণনা দাও।
৩। কোন্ মন্ত্র বলে শৈশবে রবীন্দ্রনাথ সিঙ্গিবলি দিতেন ?
৪। কে শিশু রবিকে ছড়া ও কবিতা শোনাতেন ?

পড়ুয়া

১। সবাই যখন রাতে ঘুমিয়ে পড়ত, তখন পড়ুয়া আশুতোষ কী করতেন ?
২। 'ও হরি ! গুণধর ছেলে এ কী কাণ্ড করেছে ?' আশুতোষের বাবা ছেলের কী কাণ্ড দেখে অবাক হন ?
৩। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় দেশবাসীর কাছে কী নামে পরিচিত ?

ডানপিটে

১। বীর সন্ন্যাসী কাকে বলা হয় ? ছোটবেলায় তাঁর ডাকনাম কী ছিল ?
২। ডানপিটে ছেলেটির সাহসের পরিচয় পাওয়া যায় এমন একটি ঘটনা নিজের ভাষায় গুছিয়ে লেখ।
৩। কত বছর বয়সে বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগরের স্কুলে ভর্তি হন ? তখন তার কী নাম লেখানো হয় ?
৪। ভিখিরির সাড়াশব্দ পেলে ছোটবেলায় বিবেকানন্দকে তাঁর মা দোতলার ঘরে তালাবন্ধ রাখতেন কেন ?

ধনিয়াছেলে

১। কী কারণে দাস্য ছেলে জগদীশচন্দ্রের ঠাকুরমাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল ?
২। বড় হয়ে সাধনার বলে জগদীশচন্দ্র কী হলেন ?
৩। মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন আচার্য জগদীশচন্দ্রের স্মরণে কী বলেন ?

নিজের ইতিহাস

১। 'তুমি নিজেই একদিন ইতিহাস তৈরী করবে।'—কোন ঘটনায় মাস্টারমশাই ছাত্র ক্ষুদিরামকে এ কথা বলেন?

২। বুড়োশিবের মন্দিরে ক্ষুদিরাম হত্যে দিয়ে পড়েছিল কেন? কী চেয়েছিল সে?

৩। ক্ষুদিরামের দীক্ষাগুরুর নাম কী?

৪। ক্ষুদিরামকে শহিদ বলা হয় কেন?

ন্যাড়া

১। ছোটবেলায় শরৎচন্দ্রের নাম ন্যাড়া ছিল কেন?

২। ন্যাড়ার দরদী মনের কী পরিচয় পাওয়া যায়?

৩। দুষ্টু ছেলে ন্যাড়ার দুষ্টুমির কথা যা জান গুছিয়ে লেখ।

৪। 'বেজি সাপটাকে মেরে ন্যাড়ার জীবন বাঁচিয়েছে।'—এই ঘটনাটির বর্ণনা দাও।

দুখুমিয়া

১। দুখুমিয়া নাম কোন্ কবির ছোটবেলায় রাখা হয় ও কেন রাখা হয়? মা তাঁকে আদর করে কী নামে ডাকতেন?

২। 'গরিব-দুঃখীর কষ্ট দেখলে দুখুর চোখে জল আসতো'—কোন্ ঘটনায় এ কথা জানা যায়?

৩। দুখুমিয়া কোন্ দলে যোগ দেয়? সেই দলে সে কী করতো?

৪। দুখু যখন মাথরুণ স্কুলে পড়তো, তখন সেই স্কুলের হেডমাস্টার কে ছিলেন?

সুবি

১। ইংরিজী স্কুল ছেড়ে সুবি কোন্ স্কুলে ভর্তি হয়? তখন সেই স্কুলের হেডমাস্টার কে ছিলেন?

২। স্কুলের পরীক্ষায় সুবি সংস্কৃতে কত নম্বর পায়?

৩। বৈঠকখানা ঘরের আলমারীর তাকে পিঁপড়ে হওয়ার কারণ কী?

৪। সুবি ও তার স্কুলের বন্ধুরা কী ভাবে শহিদ ক্ষুদিরামের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে?

সত্যকারের ভালোছেলে

১। ছোটবেলায় প্রফুল্লচন্দ্র নিজের হাতে কী কাজ করতেন ?

২। কলেজে পড়ার সময় প্রফুল্লচন্দ্র কোন্ বিষয়ে ভালো করে বুঝতে প্রেসিডেন্সী ক্লাশে যেতেন ? সেখানে কোন্ অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনতেন তিনি ?

৩। প্রফুল্লচন্দ্র কোন্ বৃত্তি পরীক্ষা দেন ?

৪। প্রফুল্লচন্দ্র ছাত্রজীবনে কীরূপ মেধাবী ও অধ্যবসায়ী ছিলেন ? এ বিষয়ে যা জান সংক্ষেপে লেখ।

চিত্ত

১। 'চিত্তরঞ্জন মা কে খুব ভালবাসতেন—তাঁর ছোটবেলার এমন একটি ঘটনার কথা লেখ, যাতে জানা যায় যে তিনি মাকে কত ভালবাসতেন।

২। কোন্ কবির কী কবিতা চিত্তরঞ্জনের খুব প্রিয় ছিল ?

৩। দেশের মানুষ চিত্তরঞ্জনকে দেশবন্ধু আখ্যা দেন কেন ?

৪। দেশবন্ধুর প্রয়াণে রবীন্দ্রনাথ কী লেখেন ?

দামাল ছেলে

১। যতীন কোন্ ঘটনায় বাঘা যতীন হলেন ? নিজের ভাষায় সংক্ষেপে গুছিয়ে লেখ।

২। ইংরেজ মিলিটারিকে যতীন কী ভাবে উচিত শিক্ষা দেন ?

৩। যতীনের পুরো নাম কী ?

মজার ছেলে

১। সুকুমারের বয়স ছ' বছর, সেই সময় একদিন দুপুর বেলায় তিনি কী সাহস দেখান ?

২। ছোটবেলায় কতরকম মুখভঙ্গী করে সুকুমার সবাইকে হাসাতেন ?

৩। 'সব রসগোল্লা কে একলা খেতে পারো ?'—এ কথা কে বলেন ? সে-কথার উত্তরে মজার ছেলে সুকুমার কী উত্তর দেন ?

৪। সুকুমার রায় তোমাদের প্রিয় কেন ? তাঁর লেখা একটি বইয়ের নাম লেখ।